রাজর্ষি রামমোহন

জীবনী ও রচনা

'বাংলার মনীষী', 'বাংলার ঋষি,' 'বিজ্ঞানে বাঙালী', 'ব্যায়ামে বাঙালী', 'বীরত্বে বাঙালী', 'আচার্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.-প্রণীত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য ১'৫০ নঃ পঃ

সূচীপত্র

জীবনী

নবযুগ ১
বাল্যকথা ৩
শিক্ষা-দীক্ষা ৫
সত্যাগ্রহী ৬
বৈষয়িক কর্ম ৯
রামমোহন কেমন ছিলেন ১৪
পারিবারিক ও সামাজিক জীবন—নির্যাতন ও উৎপীড়ন ২১
কলিকাতায় আগমন—জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন ২৫
আত্মীয় সভা ২৮
হিন্দুশাস্ত্র প্রচার ... ৩০
বিচার ও বিতর্ক ... ৩৪
খৃষ্টীয় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩৮
ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভা ... ৪৪
রামমোহনের ধর্মমত ও ধর্ম-সমন্বয় ৫১
সমাজ সংস্কারক ... ৫৬
নারী সমাজের কল্যাণ-ব্রতে ৬৫
সাহিত্য-স্রষ্টা রামমোহন ৬৮
শিক্ষা-বিস্তারে ৭২
পত্রিকা-সম্পাদন ... ৭৫
রাষ্ট্রগুরু ৭৮
ইংলণ্ডে গমন ·· ... ৮৪
ব্রিষ্টলে মহাপ্রয়াণ ... ৭৯

রচনা

বিবাদ-ভঞ্জন ৯৩
বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস ... ৯৫
ইতিহাস ৯৬
মিথ্যাকথন ৯৭
গন্থপাঠ ও সাহিত্যের অর্থ-নির্ণয় ১০০
ব্যাকরণের ভূমিকা ও সংজ্ঞা ১০২
যুক্তিযুক্ত বিচার—শাস্ত্র ও দেশাচার ১০৩
যুক্তি ও পরম্পরা .. ১০৫
গতানুগতিকতা বর্জন ... ১০৬
শূদ্রের বেদাধিকার ... ১০৯
নারীর অধিকার ... ১১২
সংস্কার বর্জন ও স্বাধীন চিন্তা ১১৭
ব্রাহ্মণ কে ? ১১৭
উদার ধর্মালোচনা ... ১২১
ধর্ম-বিচার—তুলনামূলক ধর্মালোচনা ও ধর্ম-সমন্বয় ১২২
নিরপেক্ষ বিচার-প্রণালী ১২৩
প্রতিধ্বনি ১২৪
অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি ১২৫
পাদ্রীদের প্রচারের প্রতিবাদ ১৩০
পাদরি ও শিষ্য-সংবাদ ১৩৩

রাজর্ষি রামমোহন

জীবনী

রাজা রামমোহন রায়

নব যুগ

দেড়শ' বছর আগেকার কথা। দেশের শাসন বিদেশী আসিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। সমাজ ধসিয়া পড়িয়াছে, লোকের কর্ম কলুষিত, চিন্তা স্থবির, চারিদিকে বিপর্যয়। আঁধারের কোলে মুখ গুঁজিয়া সারা দেশ গুমরিয়া মরিতেছে। দেশের সে মূর্তি কালিমাময়ী।

ওদিকে পশ্চিম জগতে এই সময়ে একটা প্রলয়ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। ফরাসী দেশে বিপ্লবের তূর্য-ধ্বনি বাজিয়া বাজিয়া প্রচলিত আচার বিশ্বাস সংস্কার সব-কিছু ভাঙিয়া ফেলিতেছিল।

"ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের মুখেই রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে সর্বত্র মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আর এক নূতন পালা সুরু হইয়াছে। বহু যুগের আচার ও কুসংস্কারের জীর্ণ বন্ধন হইতে এবং সকল রকম কৃত্রিম শাসন-অনুশাসনের বন্ধন হইতে মানুষকে স্বাধীন করিবার জন্য সে যুগে ফ্রান্সে ভল্‌টেয়ার, ভল্‌নি, রুশো প্রভৃতি যে রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, এদেশে রাজা রামমোহন রায়কেও সেই রণভেরী বাজাইতে হইয়াছে।"

'তাই তিনি নবযুগের অগ্রদূত। তিনি যুগগুরু। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালে রামমোহনই দীপ্ত বর্তিকা হস্তে দেশের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর পুরাতন জড়তায় আঘাত করিয়া তিনিই দেশে সম্পূর্ণ নূতন ও সজীব চিন্তাধারা আনিয়া দিলেন। বর্তমান বাঙালী রামমোহনেরই ভাববিগ্রহ। রামমোহন বর্তমান ভারতের বিরাটতম পুরুষ। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভায় বাংলার ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে—সর্বত্রই এক নব চেতনা ও নব সৃষ্টি আনয়ন করিয়াছে।

সত্য বটে, বাঙালী রামমোহন ভারতের জাতীয়তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঋষি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, রামমোহন বিশ্বমানবের মূর্ত-প্রতীক। সেদিন বিশ্বমানব রামমোহনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই বিশাল মানুষটির ভিতর স্বদেশ ও বিশ্বজগৎ যেন একসঙ্গে মিলিয়া কোলাকুলি করিয়াছে। তাই রামমোহন যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের স্বপ্নজাল রচনা করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কণ্ঠে সঙ্গীতে রূপায়িত হইয়া ধ্বনিত হইয়াছে—'ভাব সেই একে।'

বাল্যকথা

১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায় এবং মাতা তারিণী দেবী। তারিণী দেবী পরিবারের সকলের নিকট 'ফুল ঠাকুরাণী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তারিণী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন।

রামমোহনেব পূর্বপুরুষ রাজসরকারে কাজ করিয়া 'রায়রায়ান' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। তাঁহার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে রামমোহন লিখিয়াছেন—"আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ (ইঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্‌দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সফলতা লাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মানুসারে ধর্মযাজক-ব্যবসায়ী। তাঁহারা বর্তমান সময়

পর্যন্ত সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।”

রামকান্ত রায়ের তিন বিবাহ ছিল : প্রথমা নিঃসন্তান, দ্বিতীয়া তারিণী দেবী, তৃতীয়া রামমণি দেবী। তারিণী দেবীর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ জগমোহন ও কনিষ্ঠ রামমোহন এবং এক কন্যা ছিল। রামলোচন নামে রামমোহনের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিকে অধিকাংশ সময়ই একটি তুলসী উদ্যানে বসিয়া সর্বদা হরিনাম করিতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

রামমোহনের জীবনের প্রথম চৌদ্দ বৎসর প্রধানতঃ তাঁহাদের রাধানগরের বাড়ীতেই কাটে। বাড়ীতেই রামমোহনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মৌলভীর নিকট পারস্য ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করেন। সেকালে পারস্য ভাষা রাজদরবারে প্রচলিত ভাষা ছিল। ভদ্রবংশীয় বালকেরা সকলেই পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। বাড়ীতে কিছুদিন পড়াশুনা করিবার পর রামমোহন পারস্য ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। আরবী ভাষায় এরিষ্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত হইল। এই সময়ে রামমোহন মুসলমানী ধর্মশাস্ত্র কোরান অধ্যয়ন করিলেন। কোরান এবং পারস্য ভাষায় সুফীদিগের গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া বোধ হয় তাঁহার মনে এই সময় হইতেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া আসে। পরবর্তী কালে হাফিজ্, মৌলানা রুমি, শামীজ তাব্রিজ প্রমুখ সুফী কবিদিগের কবিতাসকল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু ছিল। পারস্যের সুফীদিগের ধর্মমতের সঙ্গে বেদান্ত মতের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে একজন সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে রাধানগরে চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় রামমোহনের পরিচয় হয়। ইনি পরবর্তী কালে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দ অবধূত নামে খ্যাত হন। ইঁহার সংস্পর্শে রামমোহন সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন এবং তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন।

সত্যাগ্রহী

সত্যকে স্বীকার ক'রে রামমোহন তাঁহার দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করিয়াছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট।" —রবীন্দ্রনাথ

রামমোহনের বয়স তখন ষোল কি সতের বছর। এই সময়ে তিনি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশ, পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্যটন করেন।

সেকালে দেশে সুশৃঙ্খলা ছিল না, যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেই দুঃসময়ে দুর্গম পথ ভ্রমণ করিয়া দূরদেশে যাওয়া বালক রামমোহনের একান্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় দেয়। সেই সময়ে দেশের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীরা দল বাঁধিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত। বোধ হয় বালক রামমোহন ইঁহাদেরই কোন দলের সঙ্গে মিশিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়েই দুর্গম গিরিশ্রেণী পার হইয়া তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত গমন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।" ইহার মধ্যে তিব্বত অন্যতম। তাঁহার তিব্বত যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল, বৌদ্ধধর্মের বিষয় জানা। রামমোহনের অনুসন্ধিৎসু ও সর্বদা-সচেতন মন সব-কিছু জানিবার জন্য চির-ব্যগ্র ছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার এই ভ্রমণ-কাহিনী নিজের সম্পাদিত "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা আর পাওয়া যায় না।

তিব্বতে যাইয়া তাঁহাকে একবার বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তিব্বতে সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিতকে লামা বলে। তিব্বতীরা লামাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে। তাহারা বলে, লামা জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা। নির্ভীক ও সত্যসন্ধ রামমোহন এই ভয়ানক অন্যায় কথা সহিতে পারিলেন না। তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ফলে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। তাঁহাকে মারিবার জন্য তিব্বতীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। এই বিপদের সময় কোমল-হৃদয়া তিব্বত রমণীরা তাঁহাকে বাঁচাইলেন। এই ঘটনা তাঁহার তরুণ হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাই তিনি চিরদিন নারীসমাজের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখে কুমারী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—"রামমোহনের সুকোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয়, চল্লিশ বৎসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনাসকল স্মরণ করিত। তিনি (রামমোহন) নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতবাসী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।" এইরূপে নানাদেশ বেড়াইয়া রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল রামমোহন কাশীতে থাকিয়া হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে থাকিবার সময়ে তিনি ইংরাজীও শিখিতে আরম্ভ করেন।

সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন, রামমোহন তাহা কঠিন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেন। তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাধীন চিত্তটি কোন

কিছুতেই নতি স্বীকার করিত না। ইহার পরিচয় তিনি প্রথম জীবনে যেমন দিয়াছেন, সারাজীবনও তেমনি সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন।

১৮০৩ সালে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। পিতার জীবিত কালে রামমোহন লক্ষ্যপথে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ঈপ্সিত ব্রত উদ্‌যাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। পিতৃবিয়োগের পর রামমোহন মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল-মুয়াহীদিন' প্রকাশ করেন। ইহা পারস্য ভাষায় লেখা। ইহার অর্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।' ইহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে তিনি অনেক আরবী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মতের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেই তাঁহার মনের ভিতরকার পরিচয় সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহারই লেখা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার নাম 'মনাজারাতুল আদিয়ান' বা বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা। উহা পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা পাওয়া যায় নাই।

বৈষয়িক কর্ম

রামমোহন প্রথম জীবনে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিই দেখাশোনা করিতেন। পরে কলিকাতায় তিনি কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, সিবিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া প্রভৃতি ব্যবসাও করিতেন। রামমোহন নয় বৎসর চাকুরি করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র ১ বছর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। বাকি কয় বছর তিনি ডিগবী সাহেবের খাস মুন্‌শীর কাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে ডিগবীর দেওয়ান বলিত। এই সকল কার্য করিয়া রামমোহন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি তালুক ও কলিকাতায় কয়েকটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। ডিগবী ছাড়াও তাঁহার আরো দুই জন সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক জন কলেক্টর উড্‌কোর্ড—ইহার অধীন তিনি ফরিদপুরে (সেকালে ইহার নাম ছিল ঢাকা জালালপুর) দেওয়ান ছিলেন। ফরিদপুরের পর রামমোহন কিছুকাল মুর্শিদাবাদে থাকেন। সেকালে আমাদের দেশীয় লোকের পক্ষে রাজ-সরকারে সবচেয়ে বড় চাকুরী ছিল দেওয়ানী। উহা বর্তমানকালের শেরেস্তাদারের পদ। ডিগ্‌বী সাহেব যথাক্রমে রামগড়, ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে কালেক্টার ছিলেন। সে সময়ে এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সাহেব কর্মচারীরা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত,

কাজেই তাহাদের অবস্থাও অত্যন্ত অসম্মানজনক ছিল। এই জন্য রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিবার সময় ডিগ্‌বী সাহেবকে বলিলেন, ‘আমি কার্যের জন্য আপনার সম্মুখে আসিলে, আমাকে আসন দিতে হইবে এবং আমার উপর সামান্য আম্‌লাদের ন্যায় হুকুম জারি করিতে পারিবেন না। একথা লিখিয়া আপনি স্বাক্ষর করিয়া দিন, তবেই আমি চাকুরী গ্রহণ করিব।’ ডিগ্‌বী সাহেব উহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিলেন। বোধ হয়, ডিগ্‌বী সাহেব পূর্ব হইতেই রামমোহনের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই রামমোহন এই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা এই স্পর্ধাশীল লোকটির কথায় একজন য়ুরোপীয় কালেক্টারের সেকালে এতটা উদারতা দেখাইবার মত মনোবৃত্তি হইত না। রামমোহনের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান অত্যন্ত সজাগ ছিল।

রামমোহন অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। আর একটি ঘটনা বলিতেছি। ডিগ্‌বী যখন ভাগলপুর বদলি হইয়া যান, রামমোহনও সেখানে যান। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি ভাগলপুর পৌঁছেন। রামমোহন পাল্কী চড়িয়া যাইতেছিলেন। সেখানকার কালেকটর স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন দেশী লোককে তাঁহার সাম্‌নে দিয়া চাপরাসী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া পাল্কী হইতে রামমোহনকে নামিতে বলিলেন। কিন্তু রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া

তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া পাল্কী আটকাইলেন। তখন রামমোহন পাল্কী হইতে নামিয়া ভদ্রভাবে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সাহেব রাগিয়া লাল। তাহার গালাগালি থামে না দেখিয়া রামমোহন পাল্কীতে যাইয়া বসিলেন এবং হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অপমানের প্রতিকারের জন্য রামমোহন বড়লাটকে প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতে ফল হইল। স্যর ফ্রেডারিকের উপর আদেশ হইল, দেশীয় লোকের সঙ্গে ভবিষ্যতে যেন এরূপ বচসা না করেন। এই আবেদনটি ইংরেজিতে লিখা ছিল, ইহাই হয়ত রামমোহনের প্রথম ইংরেজি রচনা (১২ই এপ্রিল, ১৮০৯)।

এই সময়ে দেওয়ানের কার্য অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তখন অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। একজন য়ুরোপীয় কালেক্টারের পক্ষে এই সমস্ত জটিল নথিপত্র ও দলিলাদি ঘাঁটিয়া বিচার করা শক্ত ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে দেওয়ানের মতামতেরই এসব ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল এবং বিশ্বস্ত দেওয়ানের উপর কালেক্টারদের একান্ত নির্ভর করিতে হইত। এই জন্য রামমোহনকেও ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিতেন।

এই সময়ে রামমোহন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কাশীতে অবস্থানকালে তিনি প্রথম ইংরাজী শিখেন। তাহা সামান্য মাত্র। তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর।

এই প্রাপ্তবয়সে তিনি অধিকতর পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি এত সুন্দর ও শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেন যে ডিগ্‌বী সাহেব নিজেও তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। য়ুরোপ হইতে ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট যে সকল সংবাদপত্র আসিত, রামমোহন তাহা সযত্নে পড়িতেন। এই সময় হইতেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় লাভ হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনা, বিশেষ ভাবে নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান ও বীরত্ব তাঁহাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিত।

রামমোহন পরবর্তী কালে 'কেন উপনিষদ্' ও 'বেদান্তের চূর্ণক' ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিগ্‌বী সাহেব বিলাতে যাইয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করেন। উহার ভূমিকাও তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, সেই সময়ে সারা দিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়ীতে ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক মাড়োয়ারী সেখানে আসিতেন। তাঁহাদের জন্য রামমোহন 'কল্পসূত্র' প্রভৃতি জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহন এই সান্ধ্য সভায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বলিতেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন। ইনি রংপুর জজকোর্টের দেওয়ান ছিলেন এবং পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞান-চন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার অনুগত অনেক

লোক ছিল। তাহাদের দ্বারা রামমোহনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও রামমোহন অ-জেয় ও অ-নতই রহিলেন।

১৮১৪ সালে ডিগ্‌বী সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। সেই বছরই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার জীবনে এক বিচিত্র কর্মবহুল অধ্যায় আরম্ভ হইল।

রামমোহন কেমন ছিলেন

(যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কথা)

রামমোহন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তাঁহার শরীরটি দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট উচ্চ ছিল। তাঁহার সুবৃহৎ মস্তিষ্ক দেখিয়া বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক যত বড় হয়, রামমোহনের মাথা তাহাদের চেয়েও অনেক বড় ছিল। বিলাতে রামমোহনের চিকিৎসক তাঁহার পাগড়ীটি ষাট বৎসর যাবৎ পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাতে যাইয়া উহা আমাদের দেশে লইয়া আসিয়াছেন। উহা এত বড় যে অনেক বড়-মাথাওয়ালা লোকের মাথায়ও উহা বড় হয়।

রামমোহনের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। তিনি সমস্ত দিনের মধ্যে বার সের দুধ পান করিতেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একবারে একটি আস্ত পাঠার মাংস খাইতে পারিতেন।

রামমোহন যখন কলিকাতায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী একদল লোক তাঁহাকে মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া রামমোহনের সিংহবীর্য গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে? তাঁহারা কি খায়?" রামমোহনের নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল।

রামমোহন মাংস ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেও নিয়মিত মাংস খাইতেন। তিনি বলিতেন, বাঙালী জাতিকে অধিকতর বলশালী হইতে হইলে, তাহাদের মাংস খাওয়া একান্ত দরকার।

রামমোহন বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এই অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেও কতিপয় বৎসর পরে তিনি ইংরাজীতে সুদক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত দশটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—সংস্কৃত, পারসি, আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক্ ও হিব্রু। সেকালে তাঁহার মত অত বড় পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ্ এদেশে কেহ ছিল না। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের মেধা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। পরম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া নির্জ্জন গৃহে সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ পড়িতে বসিলেন। এদিকে দুপুর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। কেহ সাহস করিয়া গম্ভীর-প্রকৃতি রামমোহনের তপোবিঘ্ন ঘটাইতে পারিল না। যখন তিনি পড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই একদিনে একাসনে বসিয়া তিনি নাকি সমগ্র রামায়ণখানা শেষ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। একবার এক পণ্ডিত রামমোহনের নিকট কোন একখানি তন্ত্র বিষয়ে বিচার

করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন দেখিলেন, তিনি উক্ত গ্রন্থ কখনও পড়েন নাই। পণ্ডিতকে বলিলেন, আপনি কাল ঠিক এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে। রামমোহনের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল না। পণ্ডিতটি চলিয়া গেলে, তিনি শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে ঐ পুঁথিখানি আনিলেন। সমস্ত দিনে উহা পড়িয়া ফেলিলেন। পরদিন যথাসময়ে পণ্ডিত আসিলেন। সে দিন তর্কে রামমোহনের নিকট পরাস্ত হইয়াই পণ্ডিত মহাশয়কে ফিরিতে হইয়াছিল। একবার মাত্র পড়িয়াই রামমোহন সমস্ত বইখানি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়।

রামমোহন অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করিতেন। রাত্রে দুইটা তিনটার আগে কোন দিন ঘুমাইতেন না। তাঁহার পড়ার ঘরে একটি বড় ঘুরানো গোল টেবিল ছিল। উহার উপর অনেক বই থাকিত। যখন যে-খানি দরকার পড়িত, টেবিলখানি ঘুরাইয়া দিতেন, বই হাতের কাছে আসিয়া পড়িত, তাঁহাকে উঠিয়া বই আনিতে হইত না।

রামমোহন ছেলেপিলেদের খুব ভালবাসিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। মহর্ষি তখন আট নয় বছরের বালক। মহর্ষি লিখিয়াছেন—

"রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর আমি রমাপ্রসাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোলনা ছিল। রমাপ্রসাদ ও আমি উহাতে দুলিতাম।

কখন কখনও রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।

"রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেরাদর, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানেব পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সমূহ শক্ত ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে একখণ্ড বস্ত্র মাত্র; তাঁহার এই প্রকার মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি একঘণ্টারও অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি করিতেন।

"আমি নিচুফল অতিশয় ভালবাসিতাম। যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রতাপে উদ্যানে ভ্রমণ

করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, 'বেরাদর, এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও, আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন ?' তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সুপক্ক নিচুসকল আনিতে বলিতেন।"

রামমোহন নিজের শরীরের অত্যন্ত যত্ন লইতেন। উহা ভগবানের মন্দির বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের লোকদের ন্যায় তাঁহারও বাবরী চুল ছিল। চুলগুলির অতিশয় যত্ন করিতেন এবং সেজন্য কেশবিন্যাসে তাঁহার অনেক সময় যাইত। এক কথা উল্লেখ করিয়া একদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য তারাপদ চক্রবর্তী বলিলেন, "আপনি কি 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' গানটি শুধু পরের জন্যই লিখিয়াছিলেন ?" রামমোহন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বেরাদর, ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ।" রামমোহনের কোন ত্রুটির কথা যে-কেহ উল্লেখ করিয়া বলিলে, তিনি তাহা অত্যন্ত উদারভাবে গ্রহণ করিতেন।

এখানে বলা আবশ্যক, রামমোহন তাঁহার বন্ধু ও স্নেহাস্পদ-দিগকে পরম প্রীতিভাবে 'বেরাদর' বলিয়া ডাকিতেন। বেরাদর পারসি শব্দ, উহার অর্থ ভাই। বেরাদর কথাটি তাঁহার মুখে বড়ই মিষ্টি শোনাইত।

রামমোহন একদিকে যেমন তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনি বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র বা ধনী সকলেই সমভাবে সমাদর পাইত। সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহনও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। একবার বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসেন, সেই সময়ে রামমোহনের একজন বন্ধুও উপস্থিত হন। রামমোহন উভয়কে সমান আদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

একদিন রামমোহন চোগা-চাপকান পরিয়া বৌবাজারে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, এক তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া তাহা আর তুলিতে পারিতেছে না। কেহ লোকটাকে সাহায্যও করিতেছে না। তখন রামমোহন নিজে যাইয়া লোকটার বোঝা মাথায় তুলিয়া দিলেন।

রামমোহনে পৌরুষ, তেজস্বিতা ও কুসুম-কোমল কমনীয়তা একাধারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীচতা ও ক্ষুদ্রতা রামমোহন অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিতেন। একবার কলিকাতার তদানীন্তন বিশপ মিডিলটনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিশপ কথায় কথায় রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। খৃষ্টান হইলে রামমোহনের অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইবে, তাহাও বলেন। এই কথা শুনিয়া রামমোহন বিশপটির উপর এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করেন নাই।

রামমোহনের একটি দিনলিপি এখানে লিখিতেছি।

রামমোহন খুব ভোরে উঠিতেন। প্রত্যেহ ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতেন। স্নানের পূর্বে তিনি উত্তমরূপে শরীরে তৈলমর্দন করিতেন। দুইটি জোয়ান লোক তাঁহার গায়ে তৈল মালিশ করিয়া দিত এবং শরীর ডলিয়া দিত। এই সময় তিনি মুগ্ধবোধের সূত্র পড়িতে থাকিতেন। স্নানের পর ভারতীয় প্রথায় জোড়াসন

করিয়া বসিয়া আহার করিতেন। পূর্বাহ্নে তিনি মাছভাত ও দুধ খাইতেন। ইহার পর সাধারণতঃ দুটা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজকর্ম করিতেন। তৎপর বৈকালে তাঁহার সাহেব বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রাত্রে তিনি বিলাতি নিয়মে মুসলমানী খাবার খাইতেন—পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি।

রামমোহন বাড়িতে থাকিতেও মুসলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসিতেন। পায়জামা, চোগা-চাপকান ও পাগড়ী না পরিয়া বাড়ির বাহির হইতেন না। সর্বদা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। বিলাতে মৃত্যুকালেও তাঁহার যজ্ঞসূত্র অঙ্গে সংলগ্ন ছিল। মুসলমানদের অনুকরণে কখনও খালি মাথায় বসিতেন না। ব্রহ্মসভায় যাইবার সময়েও তিনি বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বরের রাজ-দরবারে যাইতে হইলে তাহার যোগ্য পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন —নির্যাতন ও উৎপীড়ন

'মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোন সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাসার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দিবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই।"

—রবীন্দ্রনাথ

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অতি শৈশবেই বিবাহ করিতেন। তাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহও প্রচলিত ছিল। রামমোহনও এই সামাজিক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। সে বালিকা শৈবব অতিক্রম না করিতেই মারা যায়। রামমোহনের যখন নয় বছর বয়স, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্বার বিবাহ দেন। এই বছরই আর একটি মেয়ের সঙ্গেও তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রামমোহনের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ রাধাপ্রসাদ ১৮০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ।

রামমোহন তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার বিরুদ্ধে এক মকদ্দমা রুজু করেন। রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ এগুলির অংশ দাবী করেন। রামমোহন এ দাবী অগ্রাহ্য করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের পিতা নিজেই

ছেলেদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ কিছুদিন পরে মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। ইহা ছাড়াও আরো কতকগুলি মামলায় তিনি এ সময়ে জড়িত হইয়া পড়েন। আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধতা তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই।

রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় তাঁহার বিরুদ্ধ দল যাহাতে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। রামমোহনকে সবদিক্ দিয়া 'একঘরে' করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ চারি পাঁচ হাজার লোকের দলপতি ছিলেন। তাহার লোকেরা রামমোহনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া অতি প্রত্যূষে মুরগীর ডাক ডাকিত, অন্দরে গরুর হাড় ফেলিয়া দিত। রামমোহন এই সকল উৎপাত ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিতেন।

রামমোহন কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী রঘুনাথপুরে এক নূতন বাড়ী নির্মাণ করিলেন। রংপুর হইতে কর্মত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এই বাটিতে কিছু দিন বাস করিতেন। এই বাড়ির সম্মুখে একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়া উহার পার্শ্বদেশে তিনটি বৈদিক বাণী খোদিত করিয়াছিলেন—ওম্, তৎসৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই মঞ্চে তিনি প্রত্যহ তিনবার উপাসনা করিতেন। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া এবং বাড়ী হইতে কলিকাতা যাওয়ার সময় তিনি এই মঞ্চটি প্রথমে প্রদক্ষিণ করিতেন।

রামমোহনের বিপক্ষীয় দল ছড়া গাইত—

সুরাই মেলের কুল
(বেটার) বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা
কর্‌লে রফা, মজালে তিন কুল॥

ছেলেরা দল বাঁধিয়া রাজাকে ক্ষ্যাপাইত। কলিকাতায় থাকিতে তিনি যখন ব্রহ্মসভায় উপাসনা করিতে যাইতেন, লোকে তাঁহার গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়িত। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হইত।

এক সময়ে তাঁহার বিরোধী দল রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছিল। এমন দিনও গিয়াছে, যখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আততায়ী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। সেই সময়ে রামমোহন একাকী একমাত্র কিরিচ সম্বল করিয়া পথ চলিতেন। অনেক সময় তিনি পিস্তলও সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। রামমোহন অত্যন্ত সাহসী ও সতর্ক ছিলেন। গৃহে এবং বাহিরে রামমোহনকে কী যে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে, ভাবিলে তাঁহার বিশাল মনুষ্যত্বের নিকট মাথা আপনি নতি স্বীকার করে। এই যে এত নির্যাতন, উৎপীড়ন, সংগ্রাম-সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়া রামমোহন জীবনখানি

বাহিয়া চলিয়াছেন, ইহার বিরুদ্ধে তিনি কোন-দিন কাহারো কাছে অভিযোগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। তাঁহার কোন লেখাতে তিনি অন্তরের এই দ্বন্দ্বের পরিচয় দেন নাই। নির্বিকার চিত্তে সব-কিছুই সহিয়াছেন। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। মাতা-পিতা যাঁহাকে বারবার ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের পত্নীরা পর্যন্ত যাঁহার জীবন-সংগ্রাম হইতে দূরে রহিয়াছেন, সমাজ যাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই, দেশ যাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে, সেই মহাপুরুষ সেই স্বজন-পরিজন, সমাজ ও দেশবাসীর জন্য কি না করিয়াছেন। "শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? সমাজের যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালে নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

"এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এক প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে।"

কলিকাতায় আগমন—জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন

১৮১৪ সালে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর। কলিকাতা আগমন রামমোহনের জীবন-ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। এক্ষণে বিষয়-কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন একান্ত ভাবে তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইলেন। দশ বছর সরকারী কাজ করিয়া তিনি যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা দেশের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। রামমোহন এখন হইতে সমস্ত সময়, শক্তি ও অর্থ পরম উৎসাহে একান্তভাবে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সর্বক্ষণ এই কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮১৪ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই ষোল বছর তাঁহার জীবনের কর্মযুগ বলা যাইতে পারে। এই ষোল বছর রামমোহন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার সকল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। অক্লান্ত ভাবে দিনের পর দিন তিনি ঝড়ের বেগে কর্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এক একটি বছর অতিক্রম হইত, রামমোহনেরও কর্মপ্রবাহ বাড়িয়া চলিত। কত যে কাজ, কত যে ভাবনা তিনি এই কয় বছরে করিয়া গিয়াছেন তাহার বিশালতা ও বিচিত্রতার কথা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

তাঁহার কাজের কথাগুলি বলিবার পূর্বে গোটাকয়েক কথা বলিয়া লইব। রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার-সাধনে মনোযোগী হইলেন, সেই সময়ে গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ খড়্গ-হস্ত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তিনি মুষ্টিমেয় একদল লোকের বন্ধুত্বও লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের কথা একটু বলা আবশ্যক। রামমোহনের জীবন-সংগ্রামে ইঁহারা তাঁহাকে অনেকটা সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহারা পারস্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে ইঁহাদের আস্থাও বিশেষ ছিল না। এইরূপ নিরবলম্ব অবস্থায় ইঁহারা রামমোহনের পতাকাতলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, বৃন্দাবন মিত্র (ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুরদাদা), কাশীনাথ মল্লিক, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বানার্জি এবং বৈদ্যনাথ বানার্জি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা), রাজনারায়ণ সেন, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতিও তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায় মাণিকতলায় থাকিতেন। মাণিকতলায় লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি এই বাড়ীখানি কিনিয়া উহা ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত করিয়াছিলেন। রামমোহন কলিকাতার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার

এই বাড়ীতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন হইত। বিদেশ হইতে কেহ এ দেশ ভ্রমণে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইত। ইহা ছাড়াও রামমোহনের কলিকাতায় আরও বাড়ী ছিল। মাণিকতলার এই বাড়ী হইতেই রামমোহন জীবনের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

আত্মীয় সভা

রামমোহন নিজের মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'আত্মীয় সভার' প্রতিষ্ঠা একটি। যে-বছর তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন, তাঁহার পর বৎসরই আত্মীয়-সভা স্থাপিত হইল (১৮১৫)। উহা প্রথমে তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সর্বশেষে বড় বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আত্মীয় সভা সপ্তাহে একদিন করিয়া হইত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বেদান্তানুযায়ী এক ব্রহ্মের উপাসনা এবং পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকা। এই সভায় সর্বপ্রথম রামমোহনের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন। তারপর বেতন-ভোগী গায়ক গোবিন্দ মাল রামমোহনের রচিত একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন। এই সভায় সকলে প্রবেশ করিতে পারিত না। শুধু রামমোহনের কয়েক জন বন্ধু ইহাতে যোগদান করিতেন।

কিন্তু এই সময়ে আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র নিন্দা প্রচার হইতেছিল। এমন সব মিথ্যা অপবাদ রটিতে লাগিল যে আত্মীয় সভায় গো-বধ করা হয়। ফলে, রামমোহনের অনেক বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু রামমোহন দমিবার লোক ছিলেন না। অদম্য তাঁহার কর্মশক্তি ছিল, অফুরন্ত ছিল তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা।

আত্মীয় সভা যখন বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ১৮১৯ সালে উক্ত বাটীতে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের এক শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। ইহাতে হিন্দুসমাজে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমা পূজা এই তর্কের বিষয় ছিল। রামমোহন এই তর্ক-সভায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিই ইহাতে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর রামমোহনের বিরুদ্ধে নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে মামলা উপস্থিত করিলেন। দুই বছর এই মামলার জন্য রামমোহনকে বড়ই বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তদুপরি বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গেও এক মোকদ্দমা চলিয়াছিল। এই সকল কারণে আত্মীয় সভা দুই বছর বন্ধ ছিল। বিশেষতঃ রামমোহন এই সময় হইতে তাঁহার বন্ধু অ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ইউনিটেরিয়ান ভজনালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও ব্যস্ত ছিলেন।

এইরূপে কলিকাতায় একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই রামমোহন পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার প্রচার কার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হিন্দুশাস্ত্র প্রচার

রামমোহনের জীবন কর্মবহুল হইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি সর্বোপরি বিশেষ ভাবে একজন ধর্ম-সংস্কারক। রামমোহনেব ধর্মমত কি ছিল তাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে গেলে বলিব, রামমোহন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং শাঙ্করবাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে শাঙ্করবাদের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধও ছিল যথেষ্ট এবং তাঁহাকে কোন মতবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। সেকালের প্রচলিত বহুদেববাদ-সমাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই জন্যই সর্বপ্রথমে রামমোহন ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদাদি বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র গ্রন্থ-প্রচারে রামমোহনের "পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন,, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ।" বিশেষতঃ এই সময়ে দেশে স্বাধীন চিন্তা বা বিচার-বিতর্কের উন্মেষ হয় নাই, সকলে শাস্ত্রকেই যুক্তি-তর্কের অতীত বলিয়া প্রামাণ্য মনে করিত। রামমোহন সেই যুগেরই মানুষ। যদিও তাঁহার নিজের জীবনে একটা যুক্তিবাদের (Rationalism) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তথাপি পারিপার্শ্বিকের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহাকেও বাধ্য

হইয়া শাস্ত্রকেই স্বতঃ-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল, কেননা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ যুক্তি কেহ গ্রাহ্য করিত না।

১৮১৫ সালে রামমোহনের "সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ" সর্বপ্রথম বেদান্ত গ্রন্থ বা বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর বৎসর ইহার হিন্দুস্থানি (উর্দ্দু) ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে বাংলা গদ্যের শৈশবকাল। উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যরচনা বিশেষ কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। ১৮০১ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এইখানে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের বাংলা শিখাইবার জন্য ঐ কলেজের কয়েকজন পণ্ডিত খানকতক বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উহা একেবারে সংস্কৃত-ঘেষা—সন্ধি-সমাস-বিবর্জিত সংস্কৃত বই বলিলেই চলে। রামমোহনের পূর্বে ইহাই ছিল একমাত্র বাংলা গদ্য রচনা। লোকে এতদিন পদ্য রচনার সঙ্গেই অভ্যস্ত ছিল। গদ্য কি করিয়া পড়িতে হয় তাহাও লোকে জানিত না। রামমোহন এই সংস্কৃত-বহুল বাংলাকে সরল ও সহজ করিলেন। লোকে যাহাতে গদ্য পড়িতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার প্রথম বাংলা গ্রন্থ বেদান্তসূত্রে গদ্য পঠনের একটি নিয়ম লিখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সে কালে বাংলায় বিরাম-চিহ্ন কমা বা সেমিকোলনের প্রবর্তন হয় নাই।

রামমোহনের এই বেদান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তিনি (রামমোহন) তাহার (বেদান্তের) যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি বেদান্তের সমুদায় সার তাৎপর্যই তদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে কিছুতেই ঐরূপ ভাষ্য করা যায় না। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দুশাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

১৮১৬ সালে রামমোহন কেন এবং ঈশ উপনিষদ প্রকাশ করেন এবং ১৮১৭ সালে কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ প্রকাশিত হয়। শেষোক্তখানি ছাড়া ইহার সকলগুলিই তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়াছিলেন। সবগুলি উপনিষদ্ই ভাষ্য ও ভূমিকা সহিত ছাপা হইয়াছিল। তখন দাম দিয়া বই কেনার মত মনোবৃত্তি লোকের ছিল না। রামমোহন বিনামূল্যে ইহা বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেক বই একাধিক বারও ছাপাইয়া বিলি করিয়াছেন।

"বেদান্তসূত্র অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ। যদিও রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম ও মীমাংসা অবধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল না। এজন্য তিনি উহার তাৎপর্য সার সঙ্কলন পূর্বক বেদান্তসার নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।"

১৮১৬ সালে ইহার ইংরেজী অনুবাদে খ্রীস্টীয় পাদরীগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের পরিচয় য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে বাংলার পণ্ডিতেরা ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বেদ-উপনিষদের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন কি অনেকে মনে করিত, উহা রামমোহনের নিজের তৈরী জাল গ্রন্থ। বাংলাদেশে বেদ ও বেদান্তের চর্চা রামমোহন এযুগে প্রবর্তন করিলেন। ইহা বাংলার জাতীয় জীবনে তাঁহার মস্ত বড় দান।

যে বেদ শূদ্রে উচ্চারণ করিলে জিহ্বা কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাই রামমোহন আপামর সর্বসাধারণে ছড়াইয়া দিলেন। হিন্দু সমাজে বিষম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নির্যাতন রামমোহনের উপরও প্রবল বেগে পতিত হইল। সেই কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন তাঁহার ইংরাজী বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণেরও তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিবেন, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।"

রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

বিচার ও বিতর্ক

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের ফলে রামমোহনের খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি এই সময়ে ইংলণ্ড, ফরাসীদেশ এবং আমেরিকাতেও রামমোহন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে চারিদিক্ হইতে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

১৮১৩ সালে মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট কলেজের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক শঙ্কর শাস্ত্রী নামক এক পণ্ডিত 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়ার' (Madras Courier) পত্রিকায় রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিমাপূজার সমর্থন করিয়া এক চিঠি প্রকাশ করেন। উহার উত্তরে রামমোহন 'A Defence of Hinduism' (হিন্দুধর্মের সমর্থন) নামে একখানি প্রতিবাদ পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। ইহার মধ্যে শঙ্কর শাস্ত্রীর চিঠিখানিও পুনঃমুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই কলিকাতা গবর্নমেণ্ট কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রামমোহনের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইলেন। উভয় পক্ষের মতামত বাঙ্গালা এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে রামমোহন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার, রাম-

মোহনকে অতি কদর্য বিদ্রূপ ও দুর্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রামমোহন যে উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রামমোহনের উপযুক্ত। রাজা লিখিয়াছিলেন—"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়ঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্বাক্য কথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই।"

ইহার পর এক গোস্বামী রামমোহনের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। ১৮১৮ সালে ২রা শ্রাবণ রামমোহন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামে এক প্রতিবাদ-পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

ইহার পর এক কবিতাকারের পুস্তিকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া রামমোহন এক পুস্তিকা রচনা করেন (১৮২০ সাল)।

কলিকাতা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম গ্রহণ করিয়া রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন। রামমোহন উহার উত্তরে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালে উহা ছাপা হয়। ইহা প্রকাশিত হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামে আর এক গ্রন্থ ছাপিয়া রামমোহনের পাল্টা জবাব দেন। ইহাতে রামমোহনকে 'পাষণ্ড' এই নামে গালি দেওয়া হইয়াছে। রামমোহন ইহার উত্তরে 'পথ্য প্রদান' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখেন।

একদিকে রামমোহন পুস্তক লিখিয়া লিখিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা তর্কসভায় বড় বড়

পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারদ্বারাও তাঁহার মত প্রচারিত হইতেছিল। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের বিচারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮১৯ সালে বাগবাজারে চৌবের বাড়ীতে আত্মীয়-সভায় এই বিচার হইয়াছিল এবং রাজা রাধাকান্তদেব গোঁড়া হিন্দু-পক্ষীয়দিগের পৃষ্ঠপোষকরূপে এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে সহরে একটা বিষম তোলপাড় সৃষ্টি হইয়াছিল। রামমোহন এই বিচার-কথা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছাপিয়াছিলেন।

রামমোহনের "এই সকল বিচারগ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্বোক্ত বেদান্তসূত্র এবং উপনিষদ্ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও তাঁহার অনুবর্তিগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা, বেদবিচারের অক্ষমতা, এবং বিবিধ ব্যবহার-দোষ প্রদর্শন করিয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উল্লিখিত উত্তর গ্রন্থসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মর্ম পাওয়া যায়।"

এই সকল তর্ক-বিতর্কে—কি লেখায় কি আলোচনায় রামমোহনের চির গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য কখনও বিচলিত হইত না।

লোকের কটু-কাটব্যে বা নিন্দা-কুৎসায় তিনি কখনও উত্তেজিত হইতেন না। রামমোহনের আর একটি বিশেষত্ব ছিল; তিনি কখনও বাজে বকিতেন না—যতটুকু লেখা আবশ্যক বা বলা আবশ্যক শুধু তাহাই বলিতেন। রামমোহন বলিতেন—"ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।" আমার নিজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক—ইহাই তাঁহার জীবনের সকল কর্মের মূল মন্ত্র ছিল।

খৃষ্টীয় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অভিযান

১৮২০ সালে দেশবাসী অবাক্ হইয়া দেখিল, রামমোহন 'যীশু খৃস্টের উপদেশ—'শান্তি সুখের পথ' (Precepts of Jesus—Guide to Peace and Happiness) এই নামে এক নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশ রামমোহনের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাজ হইয়াছিল। একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সে সময়ের হিন্দু সাধারণের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় জানা আবশ্যক। সেকালে হিন্দুগণ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। এমন কি সাহেবদের সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি: সুপ্রসিদ্ধ স্কট্‌লণ্ডীয় মিশনারী ডাঃ ডাফ যখন কলিকাতায় প্রথম তাঁহার মিশনারী স্কুল খুলিলেন, তখন কেহ তাঁহার স্কুলে ছাত্র দিল না। অথচ ইংরেজী শিক্ষার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সেই সময়ে রামমোহনের মত প্রতিপত্তিশালী লোককে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও মাত্র ছয়টি ছেলে পাইতে হইয়াছিল। ইহাদিগকে লইয়াই ডাফ সাহেবের স্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। এমনি বিরুদ্ধ ভাব ছিল খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে। রামমোহন কিন্তু উদারতা-প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ভুল বুঝিল। রামমোহনের উপর তাহাদের বিদ্বেষ বরং বাড়িল।

ওদিকে যাহাদের প্রভুর উপদেশ রামমোহন ছাপিলেন, তাহারাও তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাহাদের ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহার কারণ, রামমোহন যীশুর উপদেশসমূহ মান্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক বৃত্তান্তগুলি একেবারে বাদ দিয়া দিয়াছেন। গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদের ইহা সহ্য হইবে কেন ?

মার্শম্যান সাহেবের প্রতিবাদের উত্তরে রামমোহন "সত্যের বন্ধু" (A Friend to Truth) নাম লইয়া An Appeal to the Christian Public (খৃষ্টীয় লোকের প্রতি নিবেদন) নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন (১৮২০ সাল)। মার্শম্যান সাহেব সহজে নিরস্ত হইলেন না। তিনি আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার উত্তরে Second Appeal to the Christian Public (খৃষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি দ্বিতীয় নিবেদন) নামে আর এক পুস্তিকা ছাপিলেন। মার্শম্যান সাহেব আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার তৃতীয় উত্তর লিখিলেন। কিন্তু ইহার ছাপা লইয়া গোল বাঁধিল। এতদিন ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস রামমোহনের বই ছাপাইয়া আসিয়াছে। এখন তাহারা ছাপিতে নারাজ হইল। কোন বিপদই রামমোহনকে কাবু করিতে পারিত না। এবারও পারিল না। তিনি নিজে এক প্রেস দিয়া বসিলেন। তাহার নাম দিলেন 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস'। এখান হইতে ১৮২৩ সালে তাঁহার Final Appeal (শেষ নিবেদন) ছাপা হইল। এই পুস্তকে তাঁহার

পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। এই সকল আলোচনার সময় রামমোহন ইংরাজীতে অনূদিত বাইবেলের জ্ঞানে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মূল বাইবেল জানিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা শিখিলেন। মূল হিব্রু বাইবেল হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখাইলেন, মার্শম্যান সাহেবের ভুল কোথায়। ইহার পর মার্শম্যান নীরব হইয়া গেলেন। কলিকাতায় এক য়িহুদীর নিকট নাকি ছয় মাসে রামমোহন হিব্রু শিখিয়াছিলেন। এই সকল বিচার-বিতর্ক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরেজ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, 'এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রামমোহন রায় এদেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই।' রামমোহনের এই সকল গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশাতেই লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে খ্রীষ্টীয় সমাজে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উইলিয়াম অ্যাডাম নামে একজন যুবক ব্যাপটিষ্ট মিশনারী শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করিবার জন্য বিলাত হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অ্যাডাম সাহেবের মত পরিবর্তন ঘটিল। ত্রিত্ববাদী গোঁড়া ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের ত্যাগ করিয়া ১৮২১ সালে তিনি একত্ববাদী (Unitarian) হইলেন। কলিকাতার খৃষ্টীয়ানগণ তাঁহাকে Second Fallen Adam বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অ্যাডাম সাহেবের এই মত-পরিবর্তন কিরূপে হইল তাহাই

বলিতেছি। রামমোহন, অ্যাডাম সাহেব ও ইয়েট্স্ (Mr. Yates) সাহেবের সাহায্যে যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার পুস্তক চতুষ্টয় বাংলায় তর্জামা করিতেছিলেন। সেই সময়ে অনুবাদ লইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রায়শই নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিত। মতদ্বৈধের ফলে ইয়েট্স্ সাহেব এই সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। অ্যাডাম সাহেব রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না, নিজের মত ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তাহাদের পরিচালিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং বাংলা পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণ' রামমোহনকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল। রামমোহনও সুদক্ষ যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি জবাব লিখিয়া পাদ্রীদের কাগজে পাঠাইলেন। তাহারা উহা ছাপিলেন না। পত্রিকা-সম্পাদকের সাধারণ ভদ্ররীতিও এইরূপে উপেক্ষিত হইল।

রামমোহন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজেই 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহাতে নিজের মতসমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিকে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা যেমন রামমোহনের বিরুদ্ধে লাগিলেন, কলিকাতাতে টাইটলর নামে এক সাহেবও তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধে কলম চালাইতে লাগিলেন (১৮২৩ সাল)। রামমোহন রামদাস নামে সাহেবের উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। রামমোহনের এক গুণ ছিল—তিনি ব্যঙ্গ করিয়া গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের বিরুদ্ধে লিখিতেন। ইহাতে প্রতিপক্ষ ক্রুদ্ধ হইত, কিছু জবাব

দিবার কিছু পাইত না। 'একপাদ্রী ও তাহার চীনদেশীয় তিন শিষ্য সংবাদ' এইরূপ একটি চমৎকার উপভোগ্য ব্যঙ্গ-রচনা।

১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' প্রকাশিত হইল। রামমোহন কেন পাদ্রীদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা প্রচার করিলেন সে কথা তিনি এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই লিখিয়াছিলেন।

"শতার্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসর তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দু ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"

উপরের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সময়ে খ্রীষ্টান পাদরীগণ দেশের লোককে খ্রীষ্টান করিবার জন্য সকল উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া পূর্ণ বেগে প্রচার-কার্য চালাইতেছিল, তাহারই মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন রাজা রামমোহন। তাঁহার মত শক্তিশালী পুরুষ এই বন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম আন্দোলন এই খ্রীষ্টীয় আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। রামমোহনের এই অসাধারণ কার্যের কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"কি সঙ্কটের সময়েই তিনি (রামমোহন) জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভা

রামমোহন কলিকাতা আসিয়া আত্মীয় সভা স্থাপন করেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আত্মীয় সভা বাঁচিয়া ছিল। তারপর বন্ধ হইয়া যায় দুই কারণে। প্রথম কারণ, রামমোহনের বৈষয়িক মোকদ্দমা। একথা পূর্বে লিখিয়াছি। দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখযোগ্য। অ্যাডাম সাহেব ধর্মমত পরিবর্তন করিয়া 'হরকরা' নামক পত্রিকার আফিসের দোতালায় 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে একত্ব-বাদী খ্রীষ্টান মতানুযায়ী উপাসনা হইত। রামমোহন ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী ইহাতে যোগদান করিতেন। কিন্তু অ্যাডাম সাহেবের এই সভা বেশী দিন টিকিল না। ১৮২৪ সালের প্রথম দিকে ইহার সভ্যসংখ্যা এত কমিয়া গেল যে, এই সভা আর কোন রকমেই বাঁচাইয়া রাখা চলে না। এই সময়টায় ব্রহ্ম-সভা স্থাপনের সঙ্কল্প রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের মনে জাগিয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছি। একদিন রামমোহন অ্যাডাম সাহেবের সভা হইতে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তদীয় শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তাঁহারা রামমোহনকে বলিলেন,—বিদেশীয়দিগের উপাসনা-স্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কথাটা রামমোহনের মনে লাগিল। এবিষয়ে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ

ঠাকুর ও টাকি-নিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে তাঁহার বাড়ীতে এই নিমিত্ত এক পরামর্শ সভা হইল। সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং হাবড়া-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই মহৎ কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন।

ইহার পর শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে চীৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সভার কার্য হইত। প্রথমে দুইজন তেলেগু বা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলায় বৈদিক ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর যন্ত্রসহযোগে সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হইত। সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং তবলা বাজাইতেন গোলাম আব্বাস। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৬০ জন লোক উপস্থিত হইতেন। সকলেই ভাল পোষাক পরিয়া আসিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সর্বপ্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে চিৎপুর রোডের পার্শ্বেই এক খণ্ড জায়গা কিনিয়া বর্তমান সমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) এই নূতন গৃহে সভার কার্য আরম্ভ হইল। এখনও এই দিনেই ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কিছুদিন ভাদ্র মাসে

বাৎসরিক উৎসব হইত। এই উপলক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী ও মথুরানাথ মল্লিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে প্রচুর ধনদান করিতেন। এই সভা তখনও ব্রাহ্মসমাজ নাম ধারণ করে নাই। ইহা সেকালে ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ নামে পরিচিত ছিল।

এই ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামমোহনের যথার্থ মনোভাব কি তাহা জানা আবশ্যক। ইহার ন্যাসপত্র (Trust Deed) রামমোহন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে তাঁহার মত জানা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner···

For the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever.

"এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন প্রকার পার্থক্য না করিয়া যে কোন লোক যথোচিত ভদ্র ও শান্ত ভাবে, ধর্মভাবে এবং ভক্তির সহিত এখানে মিলিত হইয়া সকল প্রকার সভা-সমিতি করিতে পারিবে।

"সেই শাশ্বত অচিন্তনীয় ও অব্যক্ত পরম পুরুষের উপাসনা ও সম্পূজনের জন্য—যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা—তাহারই জন্য এই উপাসনা-আলয়। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে বা অন্য কোন কিছুর উপাসনা এখানে হইতে পারিবে না।

"ইহার উপাসনাতে কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণীহিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার পান হইবে না। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বক্তৃতা বা সংগীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

ব্রহ্মসভা ও বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ, রামমোহনের ধর্মমত ও পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মমত—ইহাতে পার্থক্য ও সামঞ্জস্য কোথায় এবং কেন, তাহা পরে আলোচনা করিব। এখানে একটা বিষয় বলা আবশ্যক। তাহা ধর্মসভার কথা। ধর্মসভার আন্দোলন ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধ আন্দোলন। ধর্মসভা গোঁড়া হিন্দু সমাজের (Conservative) মুখপাত্র, ব্রাহ্মসভা উন্নতিশীল ও উদারমতা-বলম্বী হিন্দু-সমাজের (Progressive & Liberal) মিলন-ক্ষেত্র।

এই দুই দলে তখন যে প্রবল ঝগড়া-বিবাদ চলিতেছিল, তাহা সেকালের পুঁথি-পত্রাদিতে সাক্ষী রহিয়াছে।

ব্রহ্মসভা যেদিন নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল, তাহার ছয়দিন পূর্বে ধর্মসভা মহাধূমধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ইহার উদ্বোধন-দিবসে সভা-গৃহের এক মাইল দূর পর্যন্ত সারি সারি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, এই সভা তখন হিন্দু সমাজকে কিরূপ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভায় ভীষণ আড়াআড়ি চলিত। নদীর ঘাটে, বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, হাটে-বাজারে, পথে সর্বত্র এই দুই দলের বিষয়ে আলোচনা লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইত। আবার সংবাদ-পত্রে দুই দলের বাদ-প্রতিবাদ চলিত। ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অকথ্য ও তীব্র নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। রামমোহনের সাপ্তাহিক 'সংবাদ-কৌমুদী'তে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ধর্মসভার প্রচুর অর্থবল, উহার প্রচারকগণ ঘরে ঘরে যাইয়া রামমোহনের কুৎসা রটাইতে লাগিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসভার উৎসবে পারিতোষিক গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজে নিগৃহীত হইলেন। কিন্তু সবচেয়ে নির্যাতন ভোগ করিতে হইল রামমোহন নিজেকে। বিশেষতঃ এই সময়ে রামমোহনের ক্রমাগত অক্লান্ত ও অবিচলিত চেষ্টার ফলে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্য বেণ্টিঙ্কের গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্মসভা

একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। উহার তীব্রতা আসিয়া পড়িল রামমোহনের উপর। রামমোহনের নিন্দা-কুৎসার অবধি ছিল না, কত ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে উপহাস ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহার জীবন পর্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। দুইবার নাকি তাঁহাকে হত্যা করিবার বিফল প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন—কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।"

অনেকে বলিবেন, রামমোহন যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব কি আছে? অনেকে লিখিয়াছেন, সার্বভৌমিক উপাসনা প্রচার এইটিই তাঁহার নূতন। একথার উত্তরে আমরা বলিব, নূতন কে কি বলিল কিংবা করিল তাহা অনেক সময়ই তর্কের বিষয়ীভূত। কিন্তু একথা জোর গলায় বলিব, নূতনই হোক বা পুরাতনই হোক, রামমোহন সেদিন যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এই জন্যই উহার মূল্যও আছে।

এইরূপে তুমুল বাত্যা-বিক্ষোভের মধ্যে রামমোহনের আকৈশোরের স্বপ্ন ও সঙ্কল্প রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহারই জন্য বছরের পর বছর কত আবেগ ও উদ্বেগ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন। নব্য ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে ইহা এক স্মরণীয় শুভদিন—নবযুগের পুণ্যাহ। আজ একথা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়ত আমাদের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আজ ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অবস্থিতির প্রয়োজন তর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সেদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিল। ধর্ম শব্দের অর্থ যদি ইহাই হয় যে যাহা মানবসমাজকে ধারণ করিয়া বা বাঁচাইয়া রাখে তাহাই ধর্ম, তবে বলিব, ব্রাহ্মসমাজ বা ধর্ম সেদিন হিন্দুজাতিকে, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিল। উহার জীবনে সেদিন ইহাই ছিল পরম সার্থকতা। ইহারই ফলে পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের যে মহা-অভ্যুদয়ের জয়-যাত্রা সেই যে অর্ধশতাব্দী যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও প্রেরণা যোগাইয়াছিল এই মুক্তিকামীর দল—যাঁহারা রামমোহনের নেতৃত্বে তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রচলিত স্থবির গতানুগতিক নিয়ম-নিগড় ভাঙিয়া দীপ্তোজ্জ্বল ও সর্ববন্ধনমুক্ত এক মহাজীবনের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন।

রামমোহনের ধর্মমত—ধর্ম-সমন্বয়

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্মমত লইয়া বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে যথেষ্ট। 'তুহফাতুল মওয়াহিদীন' নামক গ্রন্থে তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপে যুক্তিবাদের (Rationalism) যুগ। উহার ফলে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, সংস্কার ও বিশ্বাস সব-কিছু ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই মত রামমোহনকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদীনে' তাহারই আভাস। কিন্তু ইহার পরবর্তী কালে রামমোহন যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা বিচার করিয়াছেন সর্বত্রই শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার কারণ কি? ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন। কোন ধর্মশাস্ত্রকেই তিনি অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন না। তবে প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেই পূর্বযুগ-সঞ্চিত কতকগুলি সত্য নিহিত আছে, ইহা রামমোহন বিশ্বাস করিতেন এবং এই ভাবেই প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। রামমোহন যখন যাহার সহিত বিচার-বিতর্ক করিতেন, তখন তাহার ধর্মশাস্ত্র হইতেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লইয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতেন। মুসলমানের সঙ্গে যখন তর্ক করিতেন, তখন কোরাণ প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়া তর্ক করিতেন; খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে তর্ক করিবার সময় বাইবেল হইতে দৃষ্টান্ত লইতেন, হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কের সময় হিন্দুশাস্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার

করিয়া আলোচনা 'করিতেন। এই জন্যই মুসলমানগণ তাঁহাকে বলিত জবরদস্ত 'মৌলভী, আবার ক্রিশ্চানগণের নিকট ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চান বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। রামমোহন জানিতেন, যাঁহাদের সহিত তাঁহার বিচার-আলোচনা করিতে হয়, তাঁহারা তাঁহার শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি ধারণা করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে ধর্মবিচার করিয়াছেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শাস্ত্র দ্বারাই নিজ মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনে এবং ব্যবহারে পুরাদস্তুর হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজে, হিন্দুভাবে এবং হিন্দুয়ানি অনুসারে তিনি আমরণ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কোন দিন নিজেকে অহিন্দু বলেন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট ভাবে ইহাই বলিয়াছেন— "আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" মৃত্যু সময়েও তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন খ্রীষ্টধর্মানুযায়ী করা না হয়। তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ সশ্রদ্ধ ভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ মনীষা-প্রভাবে ধর্মরাজ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। মোক্ষমূলর সাহেব বলেন, তুলনামূলক ধর্মালোচনা এযুগে রামমোহনই সর্বপ্রথমে প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা রামমোহনই

সর্বপ্রথম করিয়াছেন। উহারই ফলে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মসভার পরিকল্পনা তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ব্রহ্মসভায় তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ব্রহ্মসভা অসাম্প্রদায়িক ভাবে এক ব্রহ্মের উপাসনা স্থল। ইহা ধর্ম-সাধনার সামাজিক রূপ। এরূপ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে ছিল না। ক্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রামমোহন ইহাকে হিন্দুরূপে রূপায়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট-ডীড্ অনুসারে যে-কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের বা সমাজের লোক এখানে উপাসনাদি করিতে পারিবে। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। রামমোহন এই ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একটি সম্মিলিত উপাসনা-স্থল সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক অথচ উহারই অন্তর্বর্তী একটি আলাদা সমাজবিশেষের সৃষ্টির কথা বোধ হয় তাঁহার মনে জাগে নাই। হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ একটি সমাজ তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন কিনা তাহাও তাঁহার গ্রন্থালোচনা করিলে নির্ণীত হয় না। উহা পরবর্তী সৃষ্টি।

ধর্মরাজ্যে এইরূপ একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনদ্বারা পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রামমোহন একটা একতা সংস্থাপনের প্রয়াস পান। এই দিক্ দিয়া হয়ত বা ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের চিন্তাও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এইরূপে রামমোহন তাঁহার অসাধারণ মনীষাদ্বারা বর্তমান ভারতে একটা সামঞ্জস্যের বাণী প্রচার করেন।

ইহার পূর্বেও সামঞ্জস্যের চেষ্টা এদেশের মধ্যযুগের সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ করিয়া গিয়াছেন। নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ এই সমন্বয়েরই বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহন ইঁহাদেরই ভাবধারার সংবাহক। রামমোহনের সঙ্গে মধ্য যুগের সাধকগণের পার্থক্য এই যে, ইঁহারা শুধু হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেই সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানও এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, য়িহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির আলোচনা করিয়া একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তী যুগের পরমহংস রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে একটা মিল দেখা যায়। উভয়েই বিভিন্ন ধর্ম-প্রণালীর চর্চা ও আলোচনা করিয়া সামঞ্জস্যের বাণীর প্রচারক। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, রামমোহন যাহা অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণে তাহাই সাধনের পথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একজনে জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রধান, অপরে ভাব বা ভক্তি প্রধান। এই সামঞ্জস্যের বাণী এযুগে রামমোহনের বিশেষ দান।

ধর্মের এই সামঞ্জস্য ও সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত জীবনে কার্যকরী করিতে রামমোহন নির্ভর করিয়াছিলেন উপনিষদাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক এক-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হিন্দুশাস্ত্রের উপর। মূলতঃ কোন ধর্মমত বা ধর্মশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক নয়। উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। উহা বিশ্বজনীন এবং

অসাম্প্রদায়িক। উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর রামমোহন স্বীয় মত ও ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের জীবনের দুইটি দিক্—একটি বিশ্বজনীন এবং অপরটি জাতীয়। জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর রামমোহন এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে রামমোহন সর্বোপরি হিন্দু-সংস্কারক ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে বেদান্তানুযায়ী ব্রহ্মবাদী বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রামমোহন অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ্-উক্ত বিশুদ্ধ (সাম্প্রদায়িক ভাষা ও মতদ্বারা অকলুষিত) এক-ব্রহ্মবাদের প্রচার করেন, যদিও উপনিষদাদির অনুবাদ প্রচারে তিনি 'ভগবান্ ভাষ্যকারের' (শঙ্করাচার্যের) মতানুযায়ী ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেকে শাঙ্কর বৈদান্তিক বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষদাদি ব্যতীত ব্রহ্মোপাসনা, গায়ত্রীর অর্থ, প্রার্থনা-পত্র অনুষ্ঠান, গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং, ক্ষুদ্রপত্রী প্রভৃতি পুস্তিকা হিন্দুভাব, হিন্দু মত ও হিন্দু আদর্শের পরিচায়ক।

রামমোহন কোন নূতন ধর্মমত প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি তৎকাল-প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুকালসঞ্চিত আবর্জনা দূর করিয়া উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ যুগোপযোগী রূপ দান করিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করেন। রামমোহন কোন নব ধর্মের প্রচারক নহেন, তিনি মানবধর্মের প্রচারক। ইহাই রামমোহনের গৌরবজনক আখ্যা, 'ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক' নহে।

সমাজ-সংস্কারক

ধর্মসংস্কারক রামমোহনের পরিচয় মোটামুটি দিয়াছি। এখন তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, নারী-জাতির উপর রামমোহনের শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল। নারীর আর্তনাদ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সেকালে সতীদাহের মত অত-বড় নৃশংস ব্যাপার কিছু ছিল না। রামমোহন আমরণ ইহারই বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকালে নিজের চোখের সামনে একটি সহমরণ দেখিয়া উহার নৃশংসতা বালক রামমোহনের কোমল প্রাণে গভীর ক্ষত আঁকিয়া দিয়াছিল। ইহার পর হইতেই তিনি এই নৃশংস নারীহত্যার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেকালে সতীদাহ কি প্রকারে প্রচলিত ছিল এবং তাহা নিবারণের জন্য দেশের শাসনকর্তারা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। মৃতপতির সহিত সহমৃতা হওয়া এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নাকি প্রচলিত ছিল। ধর্ম ও পুণ্যের নামে লোকে কতদূর নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারে তাহার একটি নিদর্শন সতীদাহ। রামমোহনের সমকালে ইহাতে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা চরমে পৌঁছিয়াছিল। ভাগীরথীর দুই তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানলে বিধবা নারীগণ ভস্মীভূত হইত, তাঁহাদের করুণ আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁদিয়া উঠিত,

বাঙালীর প্রাণে তাহা সাড়া জাগাইত না। সে বীভৎস দৃশ্যের কথা ভাবিতে পারি না। চিতা সজ্জিত হইয়াছে। মৃত স্বামীর সহিত হতভাগিনী বিধবাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বক্ষণেই হয়ত হতভাগিনীকে ভাঙ্গ, চরস, ধুতুরা খাওয়াইয়া অর্ধোন্মত্ত করা হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় উহাকে চিতায় বাঁধিয়া দিয়াছে। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করিল। যমদূতের মত জোয়ান দুই ব্যক্তি প্রকাণ্ড কাঁচা বাঁশ চিতার উপর চাপিয়া ধরিয়াছে—সতী যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে না পারে। হঠাৎ তুমুল কোলাহলে দেখা গেল সতী চিতায় নাই। চিতার অসহ্য অগ্নি-উত্তাপ সহিতে না পারিয়া হতভাগিনী অর্ধদগ্ধ শরীরে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। অমনি চারিদিকে লোক ছুটিল। হায় হায়! হিন্দু ধর্ম রসাতলে গেল, কুলে কলঙ্ক পড়িল, শাস্ত্র অশুচি হইল! গভীর জঙ্গল হইতে সেই ভীত ও মৃতকল্প রমণীকে আবার জোর করিয়া চিতায় তুলিয়া দিল। ঢাক-ঢোল জোরে বাজিয়া উঠিল। হতভাগিনীর শত অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হইল—চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল—কাহারও পাষাণ হৃদয় টলিল না। তুমুল হরিধ্বনিতে নারীর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল—সহস্রশীর্ষ হুতাশন লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া সব শেষ করিয়া দিল। যে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল, লগুড় ও বৈঠার আঘাতে তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। হিন্দুধর্ম রক্ষা পাইল—হিন্দু সমাজ অটুট রহিল! হায় রে ধর্ম—হায় রে সমাজ!

এই সতী-দাহের কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি, গভর্নমেণ্ট ও তাহার কর্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫।৬ শত অনাথা রমণীকে এইরূপে নিহত করা হইত।"

এই সময়ে সতীদাহের যে তালিকা রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতা বিভাগেই এই নারীহত্যা সবচেয়ে বেশী অনুষ্ঠিত হইত। বোধ হয়, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা অনেকটা ঠিক, দূরবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া সেকালে আশা করা যায় না।

যিনি সতীদাহ প্রথা রহিত করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সেই মহানুভব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে জুলাই মাসে ভারতের গভর্নর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য গভর্নমেণ্ট সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে গেলে ১৭৮৯ সাল হইতে এ সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি পড়ে। এই সালে শাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ একটি স্ত্রীলোককে পত্যনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ এই নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করিয়া লিখিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া ইহা বন্ধ করা সমীচীন নয়। ইহার পর ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময়ে

নিজামত আদালতের হিন্দু পণ্ডিতদ্বারা সহমরণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে পরিজ্ঞাত করা হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট আদেশ বা উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ কর্মচারীদের কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য ১৮১৭ সালে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮১৫ সাল হইতে সতীদাহের সংখ্যার হিসাব রাখা হইতে থাকে।

১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন সতীদাহ নিবারণকল্পে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি পর পর তিনখানি পুস্তক লিখেন। উহা কথোপকথনচ্ছলে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ নামে লিখিত। উহার দ্বিতীয় পুস্তক ১৮২০ সালে এবং তৃতীয় পুস্তক ইহার দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনামূলক; অতএব তাহা শাস্ত্রানুসারে গর্হিত ও অকর্তব্য।"

ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুস্তকখানি লেডী হেষ্টিংএর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে গভর্নমেণ্ট হইতে সতীদাহ সম্বন্ধে পুলিশ কর্মচারি-গণকে যে সকল আদেশ-উপদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করার জন্য কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি এক আবেদন-পত্র বড়লাট হেষ্টিংসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার বিরুদ্ধে ১৮১৮ সালে আর এক আবেদন প্রেরিত হয়। ইহা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে

প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাই সকলের বিশ্বাস। ইহাতে সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার নিবারণকল্পে গভর্নমেণ্ট যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ন্যায্য ও আবশ্যক বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছিল। রামমোহনের এই সকল প্রচারের ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের আক্রমণ অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। রামমোহন স্বীয় পত্রিকা 'সংবাদ-কৌমুদী'তে সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে পুস্তক, পত্রিকা, তর্কালোচনা ও রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ দ্বারা রামমোহন প্রবল ভাবে এই আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। দেশময় একটা বিষম আলোড়ন পড়িয়া গেল। শুধু ইহাই নহে। রামমোহন নিজের বন্ধুদের লইয়া একটি দল করিলেন। যেখানে কোন সহমৃতার খবর পাইতেন, সেইখানে অমনি দৌড়াইয়া যাইতেন। সেজন্য সেই বিরাট পুরুষকে কত না অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রামমোহন কি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন? তবু ত শ্মশানে শ্মশানে ছুটিয়া যাইতেন, যুক্তিতর্ক দিয়া সহমৃতার আত্মীয়-স্বজনদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড হেষ্টিংসের পরে ১৮২০ সাল হইতে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্নর-জেনেরেল ছিলেন। অন্যান্য প্রধান রাজকর্মচারী-দিগের মত থাকিলেও আমহার্ষ্ট সতীদাহ-প্রথা একেবারে স্থগিত করার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করা ভাল বোধ করিলেন না। আমহার্ষ্টের পর ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গভর্নর-জেনেরল হইয়া আসিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বেণ্টিঙ্কের সহিত রামমোহনের পরিচয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের সাহায্য ও পরামর্শের জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রামমোহনের নিকট একজন এডিকং পাঠাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনে ব্যস্ত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লাট সাহেবকে জানাইবেন যে আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইবার বড় ইচ্ছা নাই।" এডিকং যেরূপ শুনিলেন, লাট সাহেবকে অবিকল যাইয়া তাহাই বলিলেন। বেণ্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রামমোহন রায়কে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?" এডিকং উত্তর দিলেন—"আমি বলিয়াছিলাম যে, গবর্নর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি সুখী হইবেন।" বেণ্টিঙ্ক উত্তর দিলেন—"আপনি আবার যান এবং তাঁহাকে বলুন যে মিঃ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি অনুগ্রহপূর্বক দেখা করিলে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।" এডিকং পুনরায় যাইয়া রামমোহনকে বলিলেন। রামমোহন লাট সাহেবের এই সৌজন্য ও ভদ্রতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইণ্ডিয়া গেজেটে (১৮২৯, ২৭শে নভেম্বর) রামমোহনের বিষয়ে এইরূপ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল—"এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে, সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুষ্যজাতির হিতকারিরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতীদাহ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

উৎসাহসহকারে এবিষয়ে মতামত পত্রের আকারে গভর্নর-জেনারেলের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি গভর্নর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গভর্নর-জেনারেল মহা অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের সহিত এই কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, গভর্নর-জেনারেল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন।”

রামমোহনের নিকট হইতে বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণে হিন্দু শাস্ত্রীয় সমর্থন লাভ করিলেন। বেণ্টিঙ্ক দৃঢ়চেতা কর্মিষ্ঠ লোক ছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের মত প্রতীক্ষাপরায়ণতা তাঁহার ধাতে সহিত না। তিনি দেখিলেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি থাক্ বা না থাক্, সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করিলে সর্বশেষে তলোয়ারের উপর নির্ভর করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। তিনি সৈন্যদলের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিলেন। উনপঞ্চাশ জন সুদক্ষ সেনাপতি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে সতীদাহ রদ হইলে সেনাদলের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। উহাদের মধ্যে ২৪ জন অবিলম্বে সতীদাহ রদ করিবার মতে সায় দিলেন। মাত্র পাঁচ জন কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করিলেন না। কাজেই সেনাবিভাগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল। বিচার বিভাগের ৫ জন বিচারকের মধ্যে ৪ জন অবিলম্বে সতীদাহ রদের প্রস্তাবে সায় দিলেন। পুলিশও উহা রদের জন্য এক পা'য় দাঁড়ানো। দেশের অধিবাসীর মধ্যেও রামমোহনের দল বেণ্টিঙ্কের সহায়কারী হইলেন। অতঃপর বেণ্টিঙ্ক আর বিলম্ব করিলেন না। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিষেধ করিয়া

আইন জারী করা হইল। হিন্দু সমাজে যেন একটা বোমা পড়িল। বিষম চাঞ্চল্য সমগ্র দেশময় একটা তোলপাড় উপস্থিত করিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। কলিকাতার ৮০০ শত অধিবাসীর নাম স্বাক্ষরসহ এক আবেদন গভর্নর-জেনারেলের নিকট উপস্থাপিত করিয়া সতীদাহ রদ আইন প্রত্যাহৃত করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। উহার সঙ্গে ১২৮ জন পণ্ডিতের অভিমত প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মফঃস্বল হইতে ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এবং ২৮ জন পণ্ডিতের অভিমত সহ আর এক আবেদন-পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইল।

ওদিকে এই আইনের স্বপক্ষে কলিকাতায় ৮০০ শত ক্রীশ্চান অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত অভিনন্দন-পত্র এবং ৩০০ শত অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত অন্য এক অভিনন্দন-পত্র রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করিলেন। ইহার পরদিনই গোঁড়া হিন্দুসমাজ উপলব্ধি করিলেন যে, হিন্দুসমাজকে সংঘবদ্ধ না করিলে সতীদাহ রদ-আইন রোধ করা যাইবে না। তখনই রাতারাতি 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠা হইল। প্রথম দিনের মিটিংয়েই ১১,২৬০৲ টাকা চাঁদা উঠিল। সে কী উৎসাহ! তাঁহাদের মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহারই প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। ১২৮ জন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করিয়া ইহা লিখিত

হইয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ যখন দেখিলেন, ভারতবর্ষে ইহার রদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, অবশেষে উহারা বিলাতে পার্লামেণ্টে আপিল করিলেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল এই সতীদাহ রদ আইন যাহাতে পার্লামেণ্টে পাশ হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসের ১১ জুলাই পার্লামেণ্ট ইহা পাশ করিলেন। ধর্ম-সভার আপীল অগ্রাহ্য হইল।

বাংলার বুক হইতে এক মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ অকস্মাৎ কালের অতল গর্ভে লীন হইয়া গেল।

রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে বজ্রস্থচি নামক মৃত্যুঞ্জয়াচার্য-প্রণীত এক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নারী-সমাজের কল্যাণব্রতে

সতীদাহ নিরোধের আন্দোলন নারী-সমাজের উন্নতিকল্পে রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহারই জন্য তাঁহার জীবন পর্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। সতীদাহের কথা বলা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে নারী-সমাজের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে রামমোহন কি ভাবিয়া গিয়াছেন এবং করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব।

রামমোহন নারীজাতিকে কী যে উন্নত ও মহৎ দৃষ্টি দিয়া দেখিতেন, তাহা তাঁহার রচিত সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাবসমূহে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। নারীকে কোন দিনও তিনি অসম্মান বা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নাই। ইহাদেরই নানা সমস্যা তাঁহার চিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। তাই তিনি পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা ছাপিয়া ইহাদের করুণ কাহিনী লিখিয়া হিন্দুসমাজের কুলিশ-কঠোর প্রাণে চেতনা আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বহুবিবাহ সেকালে হিন্দুসমাজের এক বিষম কলঙ্ক ছিল। উহার ফলে নারীকে আত্মসম্মান ও মর্যাদা হারাইয়া সারা জীবন দুর্বহ দুঃখে কাটাইতে হইত। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘাটিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলে দারান্তর গ্রহণে বিধি আছে এবং তাহা সার্বজনীন নয়। বহুবিবাহ নিবারণের জন্য তিনি রাজবিধির আবশ্যকতা অনুভব করিতেন।

সেকালেও দেশে কন্যাপণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা ইহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে বেশী অর্থ পাইয়া কন্যাকে রুগ্ন, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গের নিকট বিবাহ দেওয়া হইত। এই সকল কন্যার দুর্দশার সীমা ছিল না। রামমোহন মনু প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ইহার অন্যায্যতা ও অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করেন।

রাজার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় মৃত পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না। তাহাদিগকে জীবিতকালে স্বামীর, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের তথা পুত্রবধূর গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত। সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্যও এরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া থাকা ছাড়া তাহাদের অন্য পন্থা ছিল না। ইহার ফলে প্রত্যেক পরিবার কী যে বৈষম্য ও বিবাদের কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িত, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

রামমোহন এই প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রণেতৃগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তীব্র আন্দোলন করেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রগণের ন্যায় স্ত্রীও সমান অধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীর সম্পত্তির সমান অংশভাগিনী। রাজা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী দায়ভাগকারগণ প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তাদের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া পতিবিত্ত সম্বন্ধে হিন্দুনারীর অধিকার খর্ব করিয়াছেন ; এমন কি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,

অপুত্রক পুত্রের মৃত্যু হইলে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে পুত্রবধূ, পুত্রের মাতা নহে।

তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু বিধবার বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টদায়ক। বঙ্গদেশে সহমরণের সংখ্যাধিক্যের ইহাও এক কারণ। আবার এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতেই বহুবিবাহের এত আধিক্য। কারণ, পুরুষ যদি জানিত একাধিক বিবাহ করিলে প্রত্যেক স্ত্রী-ই সম্পত্তির অংশভাগিনী হইবে, তাহা হইলে তাহার বহুবিবাহের ইচ্ছা অনেকটা দমিত হইত। যেহেতু যতই কেন বিবাহ করি না, স্ত্রী বিত্তের অংশভাগিনী হইবে না এবং এমন কি তাহার ভরণপোষণের জন্যও আইনতঃ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপস্থলে বহুবিবাহ অবাধে চলিবে, ইহাতে আর সংশয় কি ?

যে কালে নারী ছিল ঘুমন্ত—শুধু নারী কেন, পুরুষও যখন নিজের সাধারণ নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অন্ধ ছিল, যখন য়ুরোপেও নারীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, সেই অনালোকিত যুগে নারীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নারীর স্বাধিকার সমুদ্ধারের কল্যাণব্রতে একাকী রামমোহনের বিরাট পৌরুষ সিংহ-বীর্যে উদ্যত হইয়াছিল। আজিকার নারী-প্রগতির যুগে বারবার নবযুগের এই ঋষির পূত চরণে তাঁহার দেশবাসী নতি জানাইতেছে।

সাহিত্য-স্রষ্টা রামমোহন

রাজা রামমোহনকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্য সামান্যই ছিল। অনেকদিন হইতেই বাংলায় একটি সমৃদ্ধ পদ্য সাহিত্য ছিল। উহা প্রায় হাজার বছর যাবৎ আছে। কিন্তু গদ্য সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। রামমোহনের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে বাংলা গদ্যের সাধারণতঃ দুইটি ধারার সূচনা হইয়াছিল। একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লিখিত সংস্কৃত-ঘেষা পণ্ডিতী বাংলা, দ্বিতীয়টি পাদ্রীদের লিখিত চলিত বাংলা। রামমোহনের ভাষায় এই দুই ধারার সামঞ্জস্য হইয়াছে। ইহাকে আমরা প্রাথমিক সামঞ্জস্য বলিতে পারি। ইহার পরে বঙ্কিমচন্দ্রে বাংলা ভাষা অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় প্রয়োজনের খাতিরে, নিছক রস-সৃষ্টির জন্য যে সাহিত্য তাহা জন্মলাভ করিয়াছে অনেক পরে। রামমোহনের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও ছিল এই প্রয়োজন-বোধ। তাই রামমোহন যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত ভাবে লোকশিক্ষার জন্যই।

পূর্বেই বলিয়াছি, গদ্য কিরূপে পড়িতে হয়, সেকালে লোকের তাহা জানা ছিল না। রামমোহনকে এজন্য তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বেদান্ত

ভাষ্যে গদ্য পঠনের নিয়ম-কানুনও লিখিয়া দিতে হইয়াছে। এদিক্ দিয়া পরবর্তী কালের বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের ন্যায় রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের স্কুল মাষ্টারি করিতে হইয়াছে। অবশ্য রামমোহন স্কুলপাঠ্য বইও লিখিয়াছেন।

রামমোহনের রচনা সকল মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। তাঁহার বেশীর ভাগ রচনা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয়; উহা অনুবাদ সাহিত্য ও আলোচনা-মূলক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই সকল বিষয়ে প্রধান প্রধান গ্রন্থের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। উহা ছাড়া তিনি আরো কয়েকখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং', 'গায়ত্রীর অর্থ', 'অনুষ্ঠান', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'প্রার্থনাপত্র', 'আত্মনাত্ম-বিবেক', 'ক্ষুদ্র পত্রী' উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর রামমোহনের সংবাদ সাহিত্য। এবিষয়ে তাঁহাকে এদেশে সকলের অগ্রণী বলা যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব।

রামমোহন বিদ্যালয়-পাঠ্য যে সকল পুস্তক লেখেন তাহার মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতির কথা জানা যায়। ইহার মধ্যে ব্যাকরণখানা পাওয়া গিয়াছে। অপরগুলির কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ব্যাকরণখানা গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

রামমোহনের আর একটি বিশেষ দান তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আধুনিক ব্রহ্মসঙ্গীতের সূচনা ইহাতে দেখিতে পাই। আবার

এদেশীয় সাধকগণের 'ভাবের গানের' প্রতিচ্ছায়াও উহাতে পড়িয়াছে। সকল সঙ্গীতেরই ভাব প্রায় একরূপ। নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ, সংসারের অনিত্যত্ব, আমিত্বের অহঙ্কার ত্যাগ —ইহাই অধিকাংশ গানের মূল কথা। দুই একটি গান উল্লেখ করিতেছি।

ইমন কল্যাণ—তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

সাহানা—ধামাল

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাকে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভালো নয়।

গৌড়মল্লার—আড়াঠেকা

সঙ্গের সঙ্গীরে মন কোথা কর অন্বেষণ
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ ?
যে বিভু করে যোজন কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ
মার্জ্জিয়া মনদর্পণ তারে কর দরশন।

রামকেলী—আড়াঠেকা

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

শিক্ষা-বিস্তারে

১৮১৬ সালের কথা। এই সময়ে পুরাতন হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড্ হেয়ার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড্ ঈষ্টের উৎসাহে ও নেতৃত্বে হিন্দু কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হন। রামমোহনের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হেয়ার সাহেবকে খুব উৎসাহ দিলেন। সমাজের নেতৃস্থানীয়দের আহ্বান করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, রামমোহনের নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে আমরা ইহাতে থাকিতে পারি না। হেয়ার সাহেব রামমোহনকে এই কথা জানাইলেন। রামমোহন অম্লান বদনে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, উহার সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। মহাপুরুষোচিত উদার কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নই।"

এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষার প্রচলন হোক। অপর দল ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, দেশের লোককে যদি যথার্থ মানুষ করিতে হয়, তবে চাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। যে জাতি

সহস্র বর্ষ ধরিয়া শুধু ‘টিপ্ করিয়া তাল পড়ে না, তাল পড়িয়া টিপ্ করে’, ‘ডান হাতে খাবে না বাম হাতে খাবে’, ‘তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল’ এই প্রকার গবেষণা করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, সেই জাতিকে কর্মঠ ও সমর্থ করিয়া তুলিতে হইলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্য তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার বিষয়ক একখানি মূল্যবান দলিল। উহা সুযুক্তি ও আন্তরিকতায় পূর্ণ।

এই সকল আন্দোলনের ফলে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকা স্থাপনের ভিত্তির প্রস্তরখণ্ডে হিন্দুকলেজের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং উভয় কলেজের একত্র ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল।

ইহার বছর খানেক পরেই রামমোহন একটি সুন্দর বাটী নির্মাণ করিয়া বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে চিঠিখানি লিখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন, বেদান্ত চর্চাদ্বারা আমাদের যুবকগণ কখনও সমাজের উন্নত ও কর্মক্ষম সভ্য হইতে পারিবে না। সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। অথচ ইহার পরেই তিনি নিজেই বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? রামমোহন সংস্কৃত সাহিত্য বা শাস্ত্রাদি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। এমন

কি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহাতে টোলগুলিকে সাহায্য করেন, তাহার কথাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন প্রচলিত শিক্ষা-বিধির যাহা বাস্তবিকই মানুষকে অমানুষ করিয়া তুলিত।

ডাফ্ সাহেবের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। এই মিশনরী সাহেবটি এদেশে আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই সময়ে রাজা রামমোহন তাহার শিক্ষা-প্রচার কার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য ব্রহ্মসভার গৃহ ছাড়িয়া দেন। ডাফ্ সাহেবের স্কুল যেদিন প্রথম আরম্ভ হয় সেদিন ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিয়াছিল। রামমোহন তাহাদিগকে বলিলেন—"বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টান হয় না। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রীষ্টীয়ান হই নাই, কোরান পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচারপূর্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তোমাদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিবে না।" ইহার পর ছাত্রেরা আপত্তি করিল না। প্রায় এক মাস কাল রামমোহন প্রত্যহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। রামমোহন রায়ের নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ইহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ তিনি নিজেই বহন করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই স্কুলে পড়িতেন। ষাটটি ছেলে এখানে পড়িত।

পত্রিকা-সম্পাদন

১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণে' বেদান্ত শাস্ত্রের নিন্দা-কুৎসা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন এবং উহার জবাব দিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। রামমোহন উহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে মিশনরীরা উহা ছাপিলেন না। রামমোহন তাঁহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ব্রাহ্মণ-সেবধি ও ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহার প্রথম দুই সংখ্যায় মিশনরীদের প্রবন্ধ এবং তৎসহ স্বীয় উত্তর মুদ্রিত করিয়া বাহির করিলেন। এই পত্রিকায় বাংলা ও ইংরাজী দুই অংশ থাকিত। ইহার এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী ও অপর পৃষ্ঠায় বাংলা সন্নিবেশিত হইত। ইহা বেশী দিন বাঁচে নাই। শুনা যায়, ১২ সংখ্যা পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে পাদ্রীদের সহিত তর্ক আলোচনার জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছিল।

রামমোহনের বিখ্যাত পত্রিকা ছিল সংবাদ-কৌমুদী। উহা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। ১৮১৯ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছিল। যদিও বিশেষভাবে রামমোহনের মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, লোকশিক্ষা, নীতি-কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প স্থান পাইত। ইহা সর্বসাধারণের পত্রিকা ছিল।

বাংলার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাঙালী বা ভারতীয় সাংবাদিকগণের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রচারে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"এই সংবাদ-কৌমুদীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীতি হইবে যে রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন তাহা নহে ; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লিখাতে তাঁহাকে বর্তমান গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।"

সংবাদ-কৌমুদী হইতে কয়েকটি গল্প বঙ্গীয় পাঠাবলী নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া রামমোহন পারস্য ভাষায় আর একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম ছিল 'মিরাৎ-উল-আখবার'। ১৮২২ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল এবং বিশিষ্ট ও শিক্ষিত সমাজের জন্য ছিল। উহাতে রামমোহন

নির্ভীক ভাবে য়ুরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, ভারত-গভর্নমেণ্টের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লিখিতেন এবং সর্বদা ন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন। আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার কথা, গ্রীসের জাগরণের কথা ইত্যাদি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইত। এই কাগজখানি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট প্রেস অর্ডিনান্স জারি করেন। রামমোহন উহার বিরুদ্ধে এদেশে এবং অবশেষে বিলাতে রাজসমীপে পর্যন্ত আবেদন করিয়া 'মিরাৎ' ছাপা বন্ধ করিয়া দেন। ভারতবর্ষে পারস্য সংবাদ-পত্রের সর্বপ্রথম সম্পাদক রাজা রামমোহন। শুধু ভারতে নয়, পারস্যেও ইহার সমাদর ছিল। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'মিরাতের' এক বিশেষ সংখ্যায় একটি প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধে কারণ নির্দেশ কবিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন-ই-জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা ফরোশ্।

যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

'পারস্য ও হিন্দুস্তানের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মীরাৎ-উল-আখবারকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রামমোহন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিবৃতিতে লিখেন—"আমার অনুরোধ যে, আমি যে স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।'

রাষ্ট্রগুরু রামমোহন

নব্য ভারতের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"For let it be remembered that Rammohan Roy was not only the founder of the Brahmo Samaj and the pioneer of all social reform in Bengal, but he was also the father of constitutional agitation in India. It is remarkable how he anticipated us in some of the great political problems which are the problems of to-day".

রামমোহনের পূর্বে আমাদের দেশের লোক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তত সচেতন ছিল না। রামমোহনই সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলেন। সেই সঙ্গে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি ন্যায় ও সত্যের উপাসক ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। বর্তমানে ভারতের সর্ববিধ বৈধ আন্দোলনের সূচনা তিনিই করেন। ভারতবর্ষে জনসাধারণের নাগরিক অধিকার রক্ষার্থ সর্বপ্রথম যে প্রতিবাদ হয় তাহা করিয়াছিলেন রাজা

রামমোহন এবং তাঁহার পাঁচ জন বন্ধু। ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে এক মানপত্র প্রদান করেন। তৎকালীন বড়লাট আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সকল পত্রিকাকেই প্রকাশের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। রামমোহন এই স্বাভাবিক অধিকার-চ্যুতির বিরুদ্ধে যে আবেদন-পত্র দিয়াছিলেন তাহা যেরূপ যুক্তিপূর্ণ সেইরূপ তেজস্বী। মানুষের স্বাধীনতা দাবী করিয়া পৃথিবীতে যে কয়খানি পত্র লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। সুপ্রীম কোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিলে রামমোহন বিলাতে আবেদন করিলেন। প্রিভি কাউন্সিল ছয় মাস অপেক্ষা করিয়া ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে উহা অগ্রাহ্য করিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহন তাঁহার মিরাত-উল-আখ্বার পত্রিকাখানি এই অসম্মানজনক সর্তে প্রকাশ করিতে অপারগ হইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজা জুরি বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই আইন অনুসারে যে কোন খ্রীশ্চান জুরীতে বসিতে পারিবেন এবং তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান সকলের বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের জুরীতে বসিবার অধিকার নাই। এমন কি তাহারা তাহাদের স্বধর্মাবলম্বী যে ক্ষেত্রে বিচারাধীন, সে-ক্ষেত্রেও জুরীতে বসিতে পারিবেন না।

রামমোহন এই পক্ষপাতদুষ্ট বৈষম্যের প্রতিবাদ করিয়া আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মসম্বন্ধীয় পার্থক্য ও

বিভেদ দ্বারা আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। রামমোহন হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাক্ষরসহ আবেদন বিলাতে উভয় পার্লা-মেণ্টে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া রাজার ইংরেজ চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন—'ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে।'

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এইরূপ এক নিষ্পত্তি করেন যে "পুত্র বা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।" রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিয়া উহা রহিত করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি-বিষয়ক যে নূতন আইন এই সময়ে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধেও তিনি বিলাত পর্যন্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন।

রামমোহন যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মনে প্রবলতম ভাবনা ছিল স্বদেশের উন্নতি ও স্বদেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বদলাইবার সময়। যাহাতে নূতন বন্দোবস্তে স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ থাকে, তাহার জন্য এই সময়ে তিনি কি না পরিশ্রম করিয়াছেন। কত সময়ে দেখা যাইত রামমোহনের উষ্ণীষশোভিত দীর্ঘ দেহ পার্লামেণ্ট-গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের নিমিত্ত পার্লামেণ্ট যে কমিটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন। ভারতের বিচার-বিভাগ ও রাজস্ব-সংক্রান্ত যে দুইটি সাক্ষ্য তিনি প্রদান করেন,

উহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, আইন জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহাতে তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পারস্য ভাষার পরিবর্তে আদালতে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন, দেওয়ানী আদালতে দেশীয় কর-নির্ধারক নিযুক্ত করা, জুরির দ্বারা বিচার প্রবর্তন, বিচারক ও রাজস্ব কমিশনর এবং বিচারক ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক করণ, সিভিল সার্ভিসে বহুসংখ্যক ভারতীয় লোক গ্রহণ, সিভিল সার্ভিসের চাকুরেদের বয়স বৃদ্ধি, কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত গ্রহণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারের জন্যও অনেক প্রচেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের কথায় তিনি বলিতেন—"চাষাভূষাদের এমনই দুরবস্থা যে ইহাদের কথা বলিতে গেলে প্রাণে বিষম ব্যথা বাজে।"

সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতা রামমোহনের জীবনের পরম কাম্য ছিল। ১৮২১ সালে স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে নিজব্যয়ে এক বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের খবর সযত্নে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বাধীনতাকামীদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। যখন ইটালীর নেপল্‌স্‌বাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে একদিন কলিকাতায় খবর আসিল, স্বাধীনতা-কামীর দল পরাজিত হইয়াছে। সেদিন রামমোহনের দুঃখের শেষ ছিল না। সেদিন তিনি বাড়ী হইতে এক পা-ও নড়িলেন না। এক বন্ধুর সঙ্গে বিকালে দেখা করিবার

কথা ছিল, তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—বিশেষ ভাবে য়ুরোপের সংবাদে আমার মন বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দেখা করিতে পারিব না। এই পত্রে তাঁহার মনের গোপনতম বাণী উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা এই—

"From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy. Under these circumstances I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful.

স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের মনে কী যে তীব্র বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা গুমরিয়া মরিত তাহা উপরের কথায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি হয়। তাই দেখি, যখন তিনি আফ্রিকার উপকূল দিয়া জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন, সেই সময় অপর জাহাজে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বার্তাবহ ফরাসীদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল, উহাকে অভিবাদন করিবার জন্য রামমোহন ভাঙ্গা পা লইয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রামমোহনের সেই স্বপ্ন ও সঙ্কল্প

তাঁহারই স্বদেশবাসী রূপায়িত করিয়া তুলিবার আয়োজনে জীবন পণ করিয়া অভিযান করিয়াছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিদূত রামমোহনের তেজোদ্দীপ্ত জীবন ও অমর বাণীর কথায় বলিয়াছেন—

"Sitting at the feet of Rammohan Roy, let us be imbued with his lofty spirit—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated by the touch of his great example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I fully believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

ইংলণ্ডে গমন

বহুদিন হইতেই রামমোহনের বিলাত যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার বিলাত যাত্রার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন —"পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ-শাসন ও ভারতবর্ষবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টেব ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।"

বিলাত-যাত্রার পূর্বে দিল্লীর বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক বাধা দিয়াছিলেন। যে দেশে শাস্ত্রদ্বারা সমুদ্রযাত্রা চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে দেশে ইহা বিচিত্র নয়। রামমোহনই সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বাধা ভাঙ্গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মিলনের পথ উন্মোচন করেন। সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বীরের মত 'আলবিয়ন' নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল রাজারাম নামে তাঁহার (পালিত) পুত্র, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামে পাচক ব্রাহ্মণ এবং রামহরি দাস নামে ভৃত্য।

রামমোহনের বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার একজন সহযাত্রী লিখিয়াছিলেন—"জাহাজে রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে আহার করিতেন ; রন্ধন করিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল না বলিয়া প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। জাহাজে কেবল একটি মাত্র সামান্য মৃণ্ময় চুল্লি ছিল। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্র-পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল ; তাহারা ক্যাবিনের মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত, কখন বাহিরে আসিত না। তিনি স্থানাভাব বশতঃ অন্য একটি স্থানে কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হৃদয় ছিলেন যে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তরিত করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ সময়ই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নের পূর্বে ও সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ুসেবন করিতেন ; এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যাত্রীসকলের আহারের পর মেজ পরিষ্কৃত হইলে তিনি আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্বক সকলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং সুনীলপ্রসারিত শুভ্রফেন-শোভিত সাগরদর্শন ও তাহার গভীর গর্জন শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।

জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইবার সময় রাজা রামমোহন ফরাসী পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—Glory, glory, glory to France.

একথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুদীর্ঘ চারিমাস তেইশ দিনে জাহাজ ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে পৌঁছিল। রামমোহন সেখানে সাদরে গৃহীত হইলেন। লিভারপুলে সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম রস্কোর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রামমোহন সেই অষ্টসপ্ততিপর বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় প্রথায় সেলাম করিয়া বলিলেন—"যাঁহার যশ শুধু য়ুরোপে নয়—সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম।" রস্কো উত্তর দিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজিকার দিন পর্যন্তও আমি জীবিত রহিয়াছি।"

লিভারপুলে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক শুনিবার জন্য লণ্ডন গমন করিলেন। লণ্ডনে তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়া সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোকসকল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। রাজাকে দেখিবার জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী রামমোহনে ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য, ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের মর্যাদা, ভারতবর্ষের মহোচ্চতা। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সর্বত্র রামমোহনের খ্যাতি প্রচারিত হইল।

১৮৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডাধিপতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজার অভিষেক-উৎসবে বৈদেশিক রাজদূতগণের সঙ্গে তাঁহার আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যদিও ইংলণ্ডাধিপতি রামমোহনের রাজা উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ

পার্লামেণ্ট তাঁহাকে ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহজে উহা স্বীকার পান নাই। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। অবশেষে উহারাও রাজার মর্যাদা রক্ষার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেবের ভাইগণ লণ্ডনের বেডফোর্ড স্কয়ারে বাস করিতেন। তাঁহারা রাজাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নিজেদের বাটিতে রাখিয়াছিলেন। রাজা সাধারণতঃ নিজে পৃথক থাকিতেই পছন্দ করিতেন।

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ লণ্ডনে এক প্রকাশ্য সভায় রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৩১ ও ৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

এই সময়ে রামমোহন স্বদেশের উন্নতিকল্পে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পার্লামেণ্ট কমিটির সাক্ষ্যও মুদ্রিত হইয়া পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৩২ সালে রামমোহন ফরাসিদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা গিয়াছিলেন। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। এই সময়েই একদিন সুপ্রসিদ্ধ কবি টমাস মুরের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হইয়াছিল।

উভয়ে এক হোটেলে আহার করিয়াছিলেন। মুরের রোজনামচায় রামমোহনের সম্বন্ধে সুন্দর কথা লেখা রহিয়াছে।

ফ্রান্স হইতে রামমোহন লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহাকে অনেক সময়ে পার্লামেণ্ট গৃহে দেখা যাইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে উক্ত সভাগৃহে উপস্থিত থাকিতেন। এই জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত এবং চিন্তিত দেখা যাইত। কুমারী কাসেলকে এই সময়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—"অদ্য কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বিতর্ক দ্বারা কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাশ হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীঘ্রই নির্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি ব্রিষ্টল যাত্রা করিব।"

ব্রিষ্টলে মহাপ্রয়াণ

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা ব্রিষ্টল নগরে ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ নামক একখানি সুন্দর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহার অধিকারিণী ছিলেন কুমারী কাসেল—একজন বিখ্যাত বণিকের একমাত্র মেয়ে। কুমারী কাসেলের অভিভাবক ছিলেন রাজার শেষ জীবনের জীবনী-লেখিকা কুমারী কার্পেণ্টার। কুমারী কাসেলের সঙ্গে লণ্ডনে থাকিতে রাজার পরিচয় ঘটে।

ব্রিষ্টলে আসিবার কয়েকদিন পরে ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে রাজা সহরের অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া ক্রমাগত তর্ক করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ইহাই রামমোহনের শেষ তর্কালোচনা ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজার জ্বর হইল। ক্রমে জ্বর বাড়িয়া চলিল, বিকার দেখা দিল। বড় বড় চিকিৎসকগণ সযত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের ভগিনী দিনরাত্রি রাজার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সকল যত্ন, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি দুইটা পঁচিশ মিনিটের সময় প্রাচীর এই দীপ্ত শিখা ইংলণ্ডে চিরতরে নির্বাপিত হইল।

রাজার চিকিৎসকের দৈনিক লিপি হইতে এই মহাপ্রয়াণের কথাটুকু বলিতেছি—

"২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। প্রতি মুহূর্তে রাজার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিঃশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র অথচ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার নাড়ী অনুভব করা যায় না। তাঁহার দক্ষিণ বাহু তিনি ক্রমাগত নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার বাম বাহু নাড়িয়াছিলেন। অদ্য চন্দ্রালোক-পূর্ণ সুন্দর রাত্রি। কুমারী হেয়ার, কুমারী কিডেল এবং আমি জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, নিশীথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য দৃশ্য। একদিকে এই, অপরদিকে এই অসাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে। এই মুহূর্তের কথা আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনস্রোত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইতেছিল। রাত্রি দুইটা পঁচিশ মিনিটের সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিঃশ্বাস পতিত হইয়াছিল।"

রাজা মৃত্যুর পূর্বে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ যেন খ্রীষ্টীয় সমাধি স্থানে খ্রীষ্টীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার নিয়মে সমাহিত করা না হয়। তদনুসারে রাজার বন্ধুগণ তাঁহার মৃতদেহ ষ্টেপল্‌টন গ্রোভের নিকটবর্তী এক নির্জন বৃক্ষবাটিকায় নিঃশব্দে পরম শ্রদ্ধাভরে সমাহিত করেন।

পরবর্তী সময়ে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি রাজার শব আর্ণস ভেল (Arnos Vale) নামক স্থানে অন্তরিত করিয়া উহার উপরে এক সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রিষ্টলের আর্ণস ভেল ভারতবাসীর পরম তীর্থস্থান।

রাজর্ষি রামমোহন

রচনাবলী

নৈতিক গল্প-সাহিত্য

বিবাদ ভঞ্জন

পূর্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাত শূন্য হয়ে কহিবে বচন ॥

একস্থানে এক মূর্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকের পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখ স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

একদিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক্ হইতে ঐ মূর্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্বে ঐ মূর্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, এই ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি স্বর্ণঢাল ? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়। প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণঢাল। দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্বক কহিল যে, এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণঢাল রাখিবেক বটে, আশ্চর্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্যঢাল লইয়া যায় নাই ? যেহেতুক ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিনশত বৎসর এইখানে আছে। স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তির উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ

করিল, তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে, দুইজন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্ছাপন্ন হইয়া রহিল।

এইকালে একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দশাপ্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল; সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষততে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। একজন বলিল যে, এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় কহিল যে, এই ব্যক্তি কহে যে ঢাল স্বর্ণের, একি চমৎকার! তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে—হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুইজন সত্য বুঝিয়াছ ও দুইজনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অ-দৃষ্ট দিক দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতুক এই ঢালের একদিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমারদের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুইদিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।

—সংবাদ-কৌমুদী, ১৮২৩

বিচার জ্ঞাপক ইতিহাস

নওসের খাঁ নামক পূর্বকালের এক বাদশাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহার বিচার-বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক পারস্য গ্রন্থমধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস একজন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে, অমুক প্রদেশের কৃষি ব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত তদপরাধোপসর্গ স্ব স্ব কর্মকারিদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে অস্ত্র দ্বারা লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ব্যক্তি আপন স্বামীর আজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল, তাহার পক্ষে একজন মুসলমান শাস্ত্রের স্মার্তবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় সুতরাং এই সংহারের পরিবর্তে স্বামীকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্তব্য, কিন্তু অন্য এক বচন আছে যে, যে ব্যক্তি যে কর্ম করে সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়। এই বচন প্রমাণে সিদ্ধান্তকর্তারা এ নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তকচ্ছেদন হয় তাহার মস্তকচ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণবধের আশঙ্কা দেখাইয়া বাধিত করিয়া কাহারো প্রাণ হননে প্রবৃত্ত করেন তবে সে স্বামী প্রাণ হননের উপযুক্ত বটে।

ইতিহাস

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে, হে বাদশাহ, আপনি সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, বাদশাহদিগের কর্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারবান তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য কি? বাদশাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবেক, সুতরাং অন্য বাদশাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল তাহা ঐ বাদশাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে নিকট আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা?

মিথ্যা কথন

মিথ্যা বাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত; এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কহা এমন ঘৃণার বিষয় যে অত্যন্ত মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ যাহারা মিথ্যা কথা কহে, তাঁহাদিগের দুই প্রকার সৌভাগ্য, এক এই যে মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে আপনারদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্যে তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, আমার সাত বৎসর বয়ক্রমের সময় আমা হইতে বয়সে বড়, এমন আর দুইজনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। একদিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে ঐ দুইজন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কিম্বা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখনো তিরস্কার করিতে পারে নাই। মিথ্যা কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে যে, যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচারসঙ্গত শাস্তি পাইবার [illegible]াবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না,

বরং সে জন্যে নিগ্রহভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না। দেখ এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন, তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেক, যে মিথ্যা কহিলে কি হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয় যে, সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। এপোলোনি নামে অন্য এক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা কর ায় না, যাহারা দাস্য কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায় তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদী ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডক্লিস্ নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল, এবং সে সদ্বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্তে আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপ ভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডক্লিসের এক অপূর্ব বাগান নানাপ্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারি পারিপাট্যেতে সর্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ একদিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডক্লিস্ ঐ ক্ষতিকারী গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র একজন

মালীর নিকটে গিয়া কহিলেক যে, ওহে ভাই মালি একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি একবার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই। মালী কহিলেক, আমি পাগল নহি, অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেক না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেগুক্লিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে মেগুক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় করিতে না পারিয়া লোকদিগের নিকট গিয়া পিতার বিপদ সমাচার কহিতে লাগিল, কেননা যদি কেহ আসিয়া উপকার করে। কিন্তু মেগুক্লিস্‌কে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেগুক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, সে স্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া শুশ্রূষা করিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেগুক্লিস্ এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন দিন মেগুক্লিস্‌কে পথিমধ্যে পাইয়া নিঘাত মারিত।

—সংবাদ-কৌমুদী, ১৮২৪

ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক রচনা

গদ্যপাঠ ও সাহিত্যের অর্থ-নির্ণয়

বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত

কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থবোধ কিঞ্চিৎ-কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

বেদান্ত-গ্রন্থ—অনুষ্ঠান

ব্যাকরণের ভূমিকা ও সংজ্ঞা

সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে ; এ নিমিত্ত এক এক অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক এক বিশেষ শব্দকে দেশভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে গৌড়দেশে নিরূপণ করেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন ; সেই সেই ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই সেই ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।

দূরস্থিত ব্যক্তির নিকট শব্দ যাইতে পারে না, একারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ বিশেষ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা সেই সেই শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ জ্ঞান হয়।

ঐ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানাপ্রকার হয়, সুতরাং তাহাকে সেই দেশীয় ভাষা ও সেই সেই দেশীয় অক্ষর কহা যায়। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

মানবের কর্তব্য ও অধিকার

যুক্তিযুক্ত বিচার-শাস্ত্র ও দেশাচার

বলৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নিদাহ করা এ সর্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এরূপ স্ত্রীবধেতে এক দেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃত হইতে পারে না, যে যে ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোন বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক কিন্তু সর্বশাস্ত্র নিষিদ্ধ যে জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্ম গণিত কদাপি হয় না। যে যে বিষয়ের শ্রুতি ও স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই সেই বিষয়ে দেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম নির্বাহ করিবেক।

যদি বল, দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্তব্য, এবং তাহা সৎকর্মে গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী এই দুই দেশে চাতুর্বর্ণ্য লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহাদের কুলাচার এই যে, বিষ্ণুকাঞ্চীস্থেরা শিবের নিন্দা করিয়া আসিতেছে, আর শিবকাঞ্চীস্থ লোকেরা বিষ্ণুর নিন্দা করে, অতএব দেশাচার কুলাচারানুসারে শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক; যেহেতু প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে, যে দেশাচার কুলাচারানুসারে নিন্দা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোনো পণ্ডিতেরা কহিবেন না যে, তাহারা দেশাচার বলে নিষ্পাপ হইবেক। এবং অন্তর্বেদের নিকটস্থ দেশে রাজপুত্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকী না হউক; যেহেতু দেশাচারে ঐ ঐ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, এরূপ অনেক উদাহরণ-স্থল আছে, অতএব সাক্ষাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দারুণ পাতককে দেশাচার প্রযুক্ত পুণ্যজনক রূপে কোনো পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন নাই।

সহমরণ বিষয়—২য় প্রস্তাব

যুক্তি ও পরম্পরা

তাবৎ হিন্দুর দেশে বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু অল্প দেশ এই বাঙ্গালা হইতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রী-বধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষতঃ কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্মভয় আছে সে এমৎ কহিবেক না যে পরম্পরা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্যাদি কর্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পার্বতীয় লোক যাহারা যাহারা পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না। বস্তুতঃ ধর্মাধর্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র-সম্মত যুক্তি হইতেছেন যে শাস্ত্রের সর্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভন দেখাইয়া বন্ধন পূর্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

সহমরণ বিষয়—১ম প্রস্তাব

গতানুগতিকতা বর্জন

পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব পুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এ বাক্যকে পরপূর্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু জাতীয়ের ধর্ম হয় যে সর্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনা বুদ্ধি আছে সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য নির্বাহ করিতে পারে। এই মত সর্বত্র সর্বকালে লইলে পর পৃথক্ পৃথক্ মত এ পর্যন্ত হইত না বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে একজন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয় আর স্মার্ত ভট্টাচার্যের পরে যাহাকে একশত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্বের মত ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যেকালে এ দেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গো-যান ছিল তাহার পরে পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্রপাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্রপাঠ করান কোন্ পূর্ব ধর্ম ছিল। অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন

উপাসনা এবং পূর্ব পূর্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্বদা স্বীকার করিতেছি তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায়।

বেদান্ত-গ্রন্থ—ভূমিকা

———

কেবল আপন আপন পূর্ব পুরুষের আচার ও ব্যবহার যদি সদাচার সদ্ব্যবহার হয় তবে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না এবং শাস্ত্রের বৈফল্য হয়, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পিতৃপিতামহের কি ধর্মাংশের কি অধর্মাংশের ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে এই মতানুসারে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী হইবেক ; বিশেষতঃ পুরাণে ও ইতিহাসে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতেছি যে লোকে পূর্ব পুরুষের উপাসনা ও আচার ভিন্ন উপাসনা ও আচার করিয়া আসিতেছেন ইহাতে শাস্ত্রত, ধর্মত. লোকত, কোন হানি হয় নাই।

———

অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকা বলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্রয়োগ স্থান বিবেচনা করা কর্তব্য। যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া তাহার অনুগামী হয় সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র 'বিবেচনা করিয়া পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির ধর্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডরিকা প্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে

দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি, এক এই যে বেদ ও বেদ শিরোভাগ উপনিষদ তাহার সম্মত মনু প্রভৃতি তাবৎ স্মৃতিসম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রসম্মত আত্মোপাসনা হয় ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগ যোগ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব সম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য অন্য কেহ কেহ করিতেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত দুর্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবল সংবাদ এবং বড়াই বুড়ার উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যে ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্টদেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্‌ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়, এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

———

শূদ্রের বেদাধিকার

বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতু রৈক্ক, বাচক্নবী প্রভৃতি আশ্রম কর্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি; আর সর্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম কর্মহীন যে সম্বর্ত প্রভৃতি, তাঁহাদেরও মহা যোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি, এবং ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল যাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে ইহা—তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব। এবং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইতেছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে এবং ভাষ্যতে দেখিতেছি, এবং শূদ্র যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদুর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি। অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই ব্রহ্ম-বিচারের অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবে না। আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন যে—'ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন।' অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারিবর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা

প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম যজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম কর্মহীন ব্যক্তিরদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্ত হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যয়নাদি আশ্রম কর্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, একথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাত ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে লিখেন, যে কেবল ঈশ্বর গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট পরিগৃহীত যে সকল প্রসিদ্ধ আগম তাহাতে কথিত যে আত্মতত্ত্বের শ্রবণ মননাদি তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল, আত্মা সত্য আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বেদান্ত গ্রথিত শব্দ সকল যেরূপ লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কারণ হয়েন; সেইরূপ ঐ সকল অর্থ কহেন, যে স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহারা আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষ প্রাপ্তির যে কারণ হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ বেদান্ত শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনিতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণ শুনেন কিনা। আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কিনা শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না।

বেদান্ত-গ্রন্থ—অনুষ্ঠান

নারীর অধিকার

স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপ নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা আছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা কাজ কর্মে অধিকার রাখেন যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায় এ পর্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুইতিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে

বাসনা করে কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহাদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহ্য করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখে সহিষ্ণুতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক লইয়া কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকল পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং সুপকারের কর্ম বিনা বেতন দিবস রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর ভৃত্যবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য

সকল একত্র স্থিতি অধিককাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের জন্য যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথবা অনেকে ধর্মভয়ে এ ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে একস্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্যস্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়,

তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য-নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে ; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন-পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

* * *

সহমরণ অনুমরণ সকাম ক্রিয়া হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষৎ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্বদা নিন্দিত রূপে কহিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে তাহার শরীর ঘটিত নিন্দিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধন-পূর্বক যে স্ত্রীবধ আপনকারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে, প্রত্যবায় আছে, অতএব বিশেষ রূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যুক্ত হই।

সংস্কার বর্জন ও স্বাধীন চিন্তা

অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসির ও অন্যান্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞান পূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর, কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।

ব্রাহ্মণ কে?

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিপ্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি ইহা প্রথমত বিচারণীয় হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি বর্ণ, কি ধর্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম, কি জ্ঞান।

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্বপ্রকারে দোষ হয়। প্রথমত সর্ব প্রাণির জীবকে একরূপ স্বরূপ স্বীকার করিলে সর্ব-

প্রাণির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়ত শরীর ভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, তেঁহ কর্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রদেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব তবে না হউক। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে তাহাতে যে জীব আছেন তিনি ব্রাহ্মণ হন এমত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহার-মূলক হইল পরমার্থ কিছুই নহে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবেক। আর ব্রাহ্মণবেশধারী কোন এক শূদ্র তাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে কিন্তু ব্রাহ্মণরূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত এক পংক্তি ভোজন ও একশয্যা শয়ন উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি ; অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আচণ্ডাল মনুষ্য সকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্তিতে ও জরা মরণাদি ধর্মতে সকল দেহ তুল্য হয়। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্ধেক শূদ্র বাঁচেন, এমত নিয়মও নাই যাহার দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে মাতাপিতার মৃতদেহকে দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি হউক ; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষি সকলও এক এক জাতি-বিশিষ্ট হয় কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি

জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ তবে, শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, উইঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভ হইতে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রা গর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্তকন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন ইঁহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি ; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণ বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণত্ব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্ল বর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ স্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ ও তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময় এই হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়, এক্ষণে এবং পূর্বকালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি ; অতএব বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত অথবা বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন ; অতএব ধর্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহাপাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং

এক্ষণেও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে ; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহিলে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান হস্তি হিরণ্য অশ্ব পৃথিবী মহিষী দানাদি কর্ম করিতেছেন কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই ; অতএব কর্ম কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকী ফল যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শমদমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ও মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে— 'জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয় উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ শব্দ বাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন'—অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল। 'যাহা হইতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাতে পুনর্গমন করে তিনি ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর,' 'সকল বেদ যে ব্রহ্ম পদকে কহিতেছেন,' 'ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয় রহিত হন' নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম'—ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয় এই সিদ্ধান্ত।

বজ্রসূচি

আমি এই খেদ করি যে আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক-শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনিও প্রায় অন্যান্য সকল মিসনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে এদেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম বিষয়ে উৎপেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে।

আপনি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন যে—'মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম উৎপত্তি হয়' আর 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল' 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতা সকল' সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তম দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম-পূর্বক দিবেন অর্থাৎ পাঁচ প্রশ্নের

পূর্বাপর নিয়ম পূর্বক যেন দেন যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন।

ধর্ম-বিচার—তুলনামূলক ধর্মালোচনা ও ধর্ম-সমন্বয়

যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে—'ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয় রহিত হয়েন'; 'সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না তথাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?'—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন—'কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,'—তাঁহাদের কর্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যাপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং

ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদ গানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে—'ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথা সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষ বিহিত গান ব্রহ্ম-বিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষ সাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন'। স্মার্তধৃত শিব ধর্মের বচন—'শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।

নিরপেক্ষ বিচার-প্রণালী

তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমান রূপে স্বীকার করা যায় আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম পালন না করে তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপেই স্বধর্মচ্যুত পাপী কহা যাইবেক। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে তবে সে এইরূপ হয় যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ দর্শনে অপারক জ্ঞান করিবেন কি না।

বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক রচনা

প্রতিধ্বনি

এমত স্থান আছে যে যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্বত আছে। সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিম্বা পর্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিম্বা পর্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহারদের সমসূত্রপাতে যে কএকবার গমনাগমন করে, সেই কএকবার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে সেখানে তূরী দ্বারা শব্দ করিলে প্রতি শব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকট দেশে যে প্রতিধ্বনি হয় সে প্রতি কথায় পাঁচবার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, ব্রুসেল্স নগরে একপ্রকার প্রতিধ্বনি আছে সে পোনের বার হয় এবং জর্মণির অন্য স্থানে অন্য হইতে এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কোন কোন সময়ে এমন বোধ হয় যে ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন কোন সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকট হইতে যায়। কোন কোন সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য

সময়েতে প্রায় শুনা যায় না, এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্তী জন প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দ হইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল, যে সে শব্দের প্রতিধ্বনি কতকালের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়তত্তা নিশ্চয় করিল।

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি

চুম্বকমণি একপ্রকার লৌহ তাহার আশ্চর্য যে যে গুণ তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে মণি ও লৌহ কিম্বা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্বার পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বকমণিতে স্পৃষ্ট লৌহশিক যদি এমত রাখা যায় যে সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতকক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবেক যে এক মুখ উত্তর দিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণ দিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বক লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতুক সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাব-সিদ্ধগুণ তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ চুম্বক লৌহের উত্তর মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড়শত বৎসর হইল নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্বে হেলিয়াছিল তদবধি ক্রমে ২ অত্যল্প পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যদি চুম্বক লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে সে সমানে খেলে সে লৌহ আড়ে সমভাবে থাকিবে না, কিন্তু এক মুখ ঊর্ধ্বগামী হয়।

চুম্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকে এই স্বাভাবিক গুণ তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে তাহার দক্ষিণ মুখ কখনও উত্তরে যায় না ও উত্তর মুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বকলৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে সে দুই পরস্পর যদি এই মত রাখা যায়, যে একটার দক্ষিণ মুখ ও আর একটার উত্তর মুখ নিকটবর্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে দুইটার উত্তর মুখ পরস্পর আসন্ন হয় তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয়।

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্যরূপ যে গুণ তাহার জন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক, যেহেতুক ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চিত করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্বে নাবিকেরদের তারা ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহাদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহাদের

পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমান্তে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একেবারে ভ্রষ্ট হইত, এবং ঐ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীস্থ লোকেরদের যে মহোপকার হইতেছে সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বকমণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বকমণির যে আকর্ষণ শক্তি সে তাহার সর্বাবয়বে তুল্য নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ শক্তি; তাহার দুই মুখ হইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন স্থান তাহা জানা যাইত না।

চুম্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে যে চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটি চুম্বকমণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে একসের হয় তবে দশ সেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটী ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ

করে এবং কোন কোন সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণ শক্তি হানি হয় না। চুম্বকমণি হইতে একাঙ্গুল দূর যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে, এবং এই মত চুম্বক-মণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও চুম্বকমণির সে শক্তি হয় না। যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার, অতএব আমারদের এই পর্যন্ত নির্বাচ্য চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে ঐ লৌহ চুম্বকমণির তুল্য কর্মোপযোগী হয়। চুম্বকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয় ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে যেহেতু প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্লভ।

চুম্বকমণির গুণ হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্ন পূর্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেকক্ষণ দক্ষিণ দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সেগুণ নষ্ট হয় এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বকমণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্তগুণ লৌহ হয় তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরো উষ্ণ জলে চুম্বকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ হানি

হয় এবং অত্যন্ত জ্বলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে একটার দক্ষিণ মুখ ও অন্যের উত্তর মুখ নিকটে থাকে তবে উভয়ের শক্তি হানি হয়।

চুম্বকমণির এই আশ্চর্য গুণের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে, পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণ ভাগে ও উত্তর ভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে তাহার আকর্ষণ শক্তিতে চুম্বকমণিব দুই মুখ দুই দিকে স্থির থাকে। চুম্বকমণির যে এই দক্ষিণ উত্তরাভিমুখ্য গুণ সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। যাহারা বেলুন দ্বারা আকাশে উঠে তাহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছে, যে উর্ধ্বে যতদূর পর্যন্ত উঠা যায় সেখানেও চুম্বকমণির শক্তি হানি হয় না এবং উত্তর দক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

(সংক্ষিপ্ত)

পাদ্রীদের প্রচারের প্রতিবাদ

শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন! প্রথম প্রকারে এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দু ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচ লোক ধনাশয় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখৃষ্টের শিষ্যরা স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা

ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান। যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামী রূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাঁহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মতঃ কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্যদেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম যদিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ তথাপি ঐ দুর্বল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্মগ্লানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম ছিল না তাহারাও কখন বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্বদা হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত

জন্মাইত। পূর্বকালে গ্রীকরা ও রোমীয়রা যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদীর ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায়সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব পূর্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ কর্তাদের ন্যায় ধর্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সম্প্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক ইতি। ব্রাহ্মণ সেবধি

ব্যঙ্গ রচনা

পাদরি ও শিষ্য সংবাদ

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাহার তিন জন চান দেশস্থ শিষ্য ইহাদের পরস্পর কথোপকথন।

পাদরি—তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক ?

প্রথম শিষ্য—উত্তর কারল, ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য—কহিল, ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য—উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে ?

সকল শিষ্য—আমরা জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম যাহা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন কিন্তু আমাদিগকে এই রূপে শিক্ষা দিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরি—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য—আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয় এমত বাঞ্ছা রাখি না কিন্তু আপনকার উপদেশে আমাদিগের আশ্চর্য বোধ হইয়াছে।

পাদরি—ধৈর্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কি রূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলিগোষ্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন ইহাতে আমাদের গণনা মতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরি—যাহা আমি দেখিতেছি তুমি অতি মূঢ় আমার অর্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক এনিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি—হাঁ এমত নহে তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর বলিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীন দেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরি—ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয় ?

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় কিন্তু আমি জানি না কিরূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য—হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে ধর্ম আমাদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি—আহা স্থূল বুদ্ধির বাক্য এই বটে চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম প্রকৃত রূপে করিতেছে। পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, যে কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর্ নিশ্চয় করিলে ?

দ্বিতীয় শিষ্য—অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর দুই হয়েন ; সে যাহা হউক তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য—সত্য বটে আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে ঈশ্বর দুই কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই হয়।

পাদরি—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য—আমরা চীন দেশীয় মানুষ, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন,

পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

পাদরি—কি বিপদ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম করা মাত্র হয়, পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে তোমরা দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম, ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই; আপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা বুঝা যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে, অতএব এই অন্তঃকরণবর্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খৃষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাদরি—এ যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য—এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বস্তু বর্তমান আছে ইহাকে স্থানান্তর করিলে ঐ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদরি—এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য—আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদিগের বুদ্ধি আপনকারদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃপুনঃ আপনি যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৯০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্র তীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

পাদরি—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করিব, কারণ তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবতা হইল।

সকল শিষ্য—এ অতি আশ্চর্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি

———